প্রকাশক :
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গপত্র

শুধু এই নাটক নহে সমস্ত লেখাতেই যাঁহাদের উৎসাহ
আমাকে প্রেরণা দেয়—

সেই অগ্রজ—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বাগচী
সুহৃদ্বর—অধ্যাপক জ্যোৎস্নাকুমার সেন
অনুজ প্রতিম—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র
এবং
আত্মীয় ও বান্ধব—শ্রীশচীভূষণ চৌধুরী-কে
নাটকখানি উৎসর্গ করিলাম।

দোল পূর্ণিমা ১৩৬৭
রায়গঞ্জ
পশ্চিম দিনাজপুর

লেখক

প্রথম দৃশ্য

[বাণীভারতী সম্প্রদায়ের কক্ষ। দেয়ালে বিখ্যাত সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পীদের প্রতিকৃতি টাঙান। এ ছাড়া বিখ্যাত দেশীয় ও বৈদেশিক সাহিত্যিক, কবি ও নেতাগণের প্রতিকৃতিও আছে। দেয়ালের মধ্যস্থলে নটরাজের প্রতিকৃতি।

বাণীভারতীর যুগ্মপরিচালক শঙ্করণ ও কেতন বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন।]

শঙ্করণ—বাণীভারতীর সকল সভ্য এবং শিল্পীকে সংবাদ দেবার ব্যবস্থা কর কেতন। বিহারের বন্যায় যারা সব হারিয়েছে তাদের জন্য আর আসামের দাঙ্গা-পীড়িতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি সাহায্য-রজনীর অনুষ্ঠান করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

কেতন—ঠিকই বলেছ! আমিও কয়েকদিন থেকে কথাটা ভাবছি। কিন্তু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবার আগে বিষয়টা আইনানুগ করে নিতে হবে। ভারত সরকারের কাছে আমাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে তাঁদের অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। এছাড়া, আর একটা ভাববার কথা আছে। আমরা যদি আমাদের শিল্পীদের প্রাপ্য দক্ষিণা পুরোপুরি দিতে যাই, তবে সাহায্য তহবিলে বেশী টাকা দিতে পারব না। শিল্পী ও সভ্যদের চিঠি দেবার সময়ে একথাটা জানিয়ে দিতে হবে।

শঙ্করণ—সরকারের অনুমতি এবং সাহায্যের কথা ভাবি না—সেটা সরকার দেবেনই—। তবে শিল্পীদের দক্ষিণার কথা বিবেচনা করে দেখবার মতই। অবশ্য আমাদের শিল্পীদের আমরা যতটুকু জানি তাতে আমার মনে হয় যে, দু' চারটি সাহায্য-রজনীর জন্য তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে আপত্তি করবেন না।

কেতন—আমারও মনে হয় অধিকাংশ শিল্পীই সাহায্য-রজনীগুলিতে সত্যিকার সাহায্য করবার আগ্রহ নিয়েই তাঁদের নৃত্যগীত, অভিনয় পরিবেশন করবেন। তবে দু'চারজন হয়ত অন্য মতও করতে পারেন।

শঙ্করণ—সত্যি কেতন—আমি আমাদের এই বাণীভারতী সম্প্রদায়ের জন্য গর্ববোধ করি। সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিল্পীরা আমাদের এই বাণীভারতীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসাবে কাজ করছেন। কোনও রকমের ভেদবুদ্ধি এদের মনকে বিষাক্ত করতে পারেনি।

কেতন—আমাদের সম্প্রদায়ের এই চমৎকার রূপ দেখে আমার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে আসে—

নানা জাতি নানা ভাষা
নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে হের মিলন মহান।

আজকের ভেদবুদ্ধি-ক্লিষ্ট ভারতবর্ষে আমরা যেন মিলনের পথিকৃৎ হিসাবে আদর্শস্থানীয় হতে পারি—এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি ভগবানের নিকট।

(একখানি সংবাদপত্র হাতে কিষণ চাঁদের প্রবেশ)

শঙ্করণ—কি কিষণ, খবর কি ? তোমায় খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

কিষণ—গুরুজী, খবর খুব খারাপ। আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়েছে। দেখতে দেখতে দাঙ্গার আগুন মীরাটে এবং আশে-পাশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

শঙ্করণ—কেতন, শুনলে খবরটা ? স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও কি এমনই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে আমরা রেহাই পাব না ?

কেতন—রেহাই পাওয়া ত দূরের কথা। চারিদিক থেকে বিভেদ যেন কুষ্ঠরোগের মত ফুটে উঠেছে। কি আশ্চর্য কথা—মানুষ যদি কুঁড়েঘরেও থাকে তবু তার দেয়ালে মাটি লেপে, আল্পনা এঁকে, ছবি এঁকে তাঁর ছোট কুটীর-খানিকে সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করে। আর আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এত বড় সোনার দেশটা হাতে পেয়েও একে সুন্দরতর করে তোলবার চেষ্টা না করে সারা দেশ জুড়ে রক্তের ছাপ এঁকে দিচ্ছি। আগুন জ্বালচ্ছি গ্রামে গ্রামে—প্রদেশে প্রদেশে।

কিষণ—গুরুজী !—আমাদের স্বরোদী ওস্তাদ মুস্তাফা আর সুলতানা বেগমের বাড়ীও ত মীরাটে। ওদের সংবাদ নেবার ব্যবস্থা—

কেতন—এখনই কর। টেলিগ্রাম করা যায় না ?

শঙ্করণ—এত উৎপাতের মধ্যে কি টেলিগ্রাম হবে ?

কেতন—সে কথাও ত ঠিক। তবে—?

(কিষণ চাঁদের দিকে তাকাইল)

কিষণ—চেষ্টা করে দেখা যাক।—

কেতন—হ্যাঁ! রিপ্লাইপেইড টেলিগ্রাম কর। আর কোনও সংবাদ পেলেই আমাদের জানাবে।

শঙ্করণ—আর সেই সঙ্গে সাহায্য রজনীর প্রস্তাবটাও সকলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

কেতন—আচ্ছা সে চিঠির খসড়া আমি করে দিচ্ছি। কিষণ, তুমি টেলিগ্রামটা করে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার কাছ থেকে একটা চিঠির খসড়া নিয়ে নকল করে আমাদের যত শিল্পী এবং সভ্য আছেন—সকলের কাছে পাঠিয়ে দেবে। চিঠিটা পড়ে তোমার নিজের মতামতটাও আমাদের জানিয়ে দেবে, বুঝলে।

কিষণ—বুঝেছি। আমি তাহলে আসি—

(প্রস্থান)

শঙ্করণ—দাঙ্গার খবরে মনটা খারাপ হয়ে গেল কেতন। ভারতবর্ষের জনগণ কি স্বাধীনতা পেয়ে একতা ভুলল? কই স্বাধীনতার আগে ত প্রদেশে প্রদেশে এত মনের অমিল ছিল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাঝে মাঝে হত—সেকথা মানি। কিন্তু তাও ত সৃষ্টি হয়েছিল তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায়। আশা করেছিলাম, স্বাধীনতার পর প্ররোচনা দেওয়ার মত কেউ না থাকলে সেটুকুও চলে যাবে। কিন্তু একি বিকৃত বীভৎস মনোবৃত্তি ভারতের অধিবাসীদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিচ্ছে।

কেতন—আমাদের জাতীয় চরিত্রের অত্যন্ত কুৎসিৎ একটা

দিক আজ প্রকাশ পাচ্ছে। উদার দৃষ্টি মেলে জন্মভূমির দিকে না চাইলে এ বিভেদ দূর হবে কি করে? যাক্ সে কথা। সাহায্য-রজনীর অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করা যাক।

শঙ্করণ—স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে আমার আগে যে ধারণা ছিল, এই মুহূর্তে তা বদলে ফেললাম। শোন কেতন!—আমরা আদর্শ স্থাপন করতে চাই। আসামের দাঙ্গা পীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য-রজনীর অনুষ্ঠান আমরা আসামেই করব। যারা অন্যায় করেছে তারাই এগিয়ে আসবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে—উৎপীড়িতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে।

কেতন—আদর্শের দিক দিয়ে মহান উদাহরণ হলেও হয়ত আমরা ঠিক সফল হব না। অর্থের পরিমাণও হয়ত আশানুরূপ হবে না, তাছাড়া বিপদের সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না।

শঙ্করণ—তবুও আসামেই আমাদের সাহায্য-রজনী অনুষ্ঠিত হবে। মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগাবার প্রচেষ্টায় যদি আমরা বিপদকে আলিঙ্গন করি তার প্রতিক্রিয়া হবেই দুষ্কৃতিকারীদের মনে।

কেতন—বেশ তাই হোক। আর বিহারের বন্যার্তদের জন্য আমরা অনুষ্ঠান করব বাঙলা দেশে।

শঙ্করণ—বাঙ্গলা দেশ চিরকালই উদার। তবুও তার উদারতায় ফাটল ধরেছে দেশ জোড়া দূষিত আবহাওয়ার প্রভাবে।

আমাদের প্রচেষ্টায় হয়ত সেটুকুও দূর হয়ে যাবে। সম্প্রতি প্রদেশ পুনর্গঠন নিয়ে বাঙলা ও বিহারে যে মনান্তর হয়েছিল, বাঙলা আজ তা ভুলেছে আশা করি—তবুও—

(কিষণ চাঁদের প্রবেশ)

কিষণ—টেলিগ্রাম করে এলাম। আপনার একখানি চিঠি।

(শঙ্করণকে চিঠি দিল—শঙ্করণ পড়িতে লাগিল)

কেতন—পোস্ট অফিসে কি জিজ্ঞাসা করেছিলে যে, টেলিগ্রাম ঠিকমত পৌঁছাবে কিনা?

কিষণ—ওরা বলল—পৌঁছাবে ঠিকই—তবে সময় মত নয়।

(শঙ্করণ চিঠি পড়িতে পড়িতে ক্রমেই উত্তেজিত হইতেছিল—এবার বলিয়া উঠিল)

শঙ্করণ—আশ্চর্য! বিস্ময়কর!

কেতন—কি ব্যাপার শঙ্করণ?

শঙ্করণ—ষণ্মুখম-এর চিঠি। সে কি লিখেছে জান?

কেতন—কি!

শঙ্করণ—সম্প্রতি সে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম আন্দোলনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের সংস্পর্শে এসেছিল। তাদের সারগর্ভ যুক্তিতে সে বুঝতে পেরেছে যে, দ্রাবিড়-সভ্যতা এবং আর্য-সভ্যতা সম্পূর্ণ পৃথক। দ্রাবিড়গণ যে আর্য্য-সভ্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এটা তাদের পরাজিতের মনোবৃত্তি। বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতারই এক রূপান্তর। এই

মনোভাব থেকে জেগে ওঠাই সুস্থতার লক্ষণ। সেইজন্য সে দ্রাবিড় কাজাঘাম আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে।

কেতন—কি দুঃখজনক পরিবর্তন! তোমার প্রিয় শিষ্য ষণ্মুখম শেষে এই বিকৃত মনোভাবের দাস হয়ে গেল।

শঙ্করণ—শুধু কি এই? সে আরও লিখেছে যে, নৃত্যশিল্প সে জীবনের লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছিল তার অধিকাংশই আর্য-সভ্যতার দান। সেজন্য সে নৃত্যও ত্যাগ করল।

কিষণ—ষণ্মুখম নাচ ছেড়ে দিয়েছে। কি আশ্চর্য! এমন নিষ্ঠাবান শিল্পী খুব কম দেখা যায়। দিনের পর দিন নাচের আঙ্গিক কত নিখুঁত হয়। তার সাধনায় তন্ময় হয়ে থাকত সে। নূতন নূতন পরীক্ষায় ও পরিকল্পনায় ওর উৎসাহ ছিল সকলের চেয়ে বেশী।

শঙ্করণ—সার্থক হয়েছিল আমার শিক্ষা ওর মত ছাত্র পেয়ে। ওর এই মনোভাব বড়ই দুঃখের—বড়ই লজ্জার। জান কেতন, সংস্কৃতের গন্ধ আছে বলে ওর ষণ্মুখম নাম পর্যন্ত ত্যাগ করেছে।

কেতন—কি শোচনীয় অধঃপতন!

শঙ্করণ—দেশ জুড়ে এই অধঃপতনের স্রোত চলেছে কেতন—এর দুর্বার বেগের মুখে ষণ্মুখমের মত মানুষের প্রতিরোধ শক্তি কতটুকু!

কেতন—কিন্তু কাউকে না কাউকে দাঁড়াতে হবে এই পাতাল-গামী স্রোতধারার পথ রোধ করে। এস শঙ্করণ—আমরা দাঁড়াই এই অধঃপতনের স্রোত রোধ করে পাষাণ

প্রাচীরের মত। বিভেদের আকাশ-স্পর্শী অগ্নিশিখার মধ্যে বর্ষার জলধারার মত ঝরে পড়ুক আমাদের এই বাণীভারতীর কল্যাণ প্রচেষ্টা।

(শঙ্করণ উৎসাহ ভরে উঠিয়া দাঁড়াইল)

শঙ্করণ—সাধু—সাধু। সাহিত্যিক তুমি, শিল্পী তুমি। তোমার লেখনী রচনা করুক এমন নাটক, যা ভারতবাসীর হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়—তাদের বুঝতে প্রেরণা দেয় যে সব ভারতবাসীর ধমনীতে একই রক্ত বয়ে যাচ্ছে। একই সংস্কৃতির আহ্বান তাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে। হতে পারে ধর্ম ভিন্ন, হতে পারে ভিন্ন প্রদেশ, ভিন্ন খাদ্য তবুও সকলের সংস্কৃতি এক এবং অভিন্ন।

কেশুন—হ্যাঁ, বোঝাতে চেষ্টা করব—মানুষ শুধু খাদ্য খেয়ে বাঁচে না—ভাষা উচ্চারণ করেই মনের ভাব প্রকাশ করে না, শুধু পরিচ্ছদ সাজায় না মানুষকে। সংস্কৃতি তার মনকে পুষ্ট করে; কথার সূক্ষ্মতম বিকাশ যে কাব্যে এবং গানে তাও সংস্কৃতিরই দান। মানুষের সজ্জা তার সাংস্কৃতিক পরিচ্ছদে। সেই সংস্কৃতিতে যে ঐক্য তা কেন নষ্ট হবে—ধর্ম, প্রদেশ বা ভাষার বিভিন্নতায় ?

শঙ্করণ—আমাদের শিল্পীরা রূপ দেবে তোমার চিন্তাধারাকে। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে আমরা এই বাণী-ভারতী নিয়ে ঘুরে বেড়াব। প্রচার করব এই মহান ঐক্যের বার্তা, বাণীভারতী নাম সার্থক হবে এই কাজের মধ্যে।

কেতন—কিষণচাঁদ ! তুমি আমাদের সমস্ত শিল্পীকে এখানে একত্র হবার জন্য লিখে দাও। আরও লিখবে, যে ব্রত আমরা গ্রহণ করলাম, তাতে তাদের যথাযোগ্য পারিশ্রমিক হয়ত দিতে পারব না। তবু এই জাতির দুর্দিনে, এই পুণ্য কার্যে তাদের আহ্বান করছি দেশের নামে—জাতির ও ঐক্যের নামে। কি বল কিষণচাঁদ—আমাদের শিল্পীরা কি সাড়া দেবে না ?

কিষণ—নিশ্চয়ই দেবে গুরুজী, নিশ্চয়ই দেবে। আমারই মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমি আজই সকলকে চিঠি দিচ্ছি—

(চলিয়া গেল)

কেতন—শঙ্করণ ! তোমাকে এক কাজ করতে হবে। তুমি ষণ্মুখমকে বিশেষ অনুরোধ করে লেখ, সে দ্রাবিড় কাজাঘাম আন্দোলনে যোগ দিক, তাতে তোমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তার আগে সে যেন তোমার সঙ্গে দেখা করে। তারপর এখানে এলে আমরা যে ভাবেই হোক ওকে কিছুদিন আমাদের সঙ্গে রাখবার ব্যবস্থা করব। আমাদের প্রচারিত এই নূতন বার্তা প্রচারকারী নাটক দেখে দেখে নিশ্চয়ই তার মনের পরিবর্তন হবে।

শঙ্করণ—তাই করি—। তবে সে কি আসবে ?

কেতন—নিশ্চয়ই আসবে। সাময়িক উত্তেজনার বশে সে যাই করুক, সে শিল্পী। শিল্পের জন্ম মনের উচ্চতর বৃত্তি থেকে। আগুন নীচের দিকে ধরলেও তার শিখা নীচের

দিকে যায় না। ঐ শিল্পী-মনই আবার তাকে টেনে আনবে আমাদের দিকে।

শঙ্করণ—আমার মনে নূতন জোয়ারের সাড়া পাচ্ছি কেতন, পারব আমরা সত্যিই এই দুর্দিনের রং বদলাতে এবং নবীন ভারতকে সুন্দরতর করবার বাণী জনগণের হৃদয়ে গেঁথে দিতে।

হে নটরাজ! তোমার পদতলে দলিত কর অশুভ প্রেতকে। তোমার অগ্নি মেখলায় দ্রবীভূত হোক অজ্ঞানতার অন্ধকার—ভেদবুদ্ধি ভস্মীভূত হোক। এস কেতন—সেই সাধনার, সে আরাধনার বাণী রচনা করি আমরা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মীরাটে ওস্তাদ মুস্তফার বসিবার ঘর। ওস্তাদ বসিয়া তানপুরা লইয়া রাগপ্রধান সঙ্গীত গাহিতেছেন। তাঁহার শিষ্য বিলাওল খাঁ তবলা সঙ্গত করিতেছিল]

গান (রাগ প্রধান)

হে অনাদি হে অন্তহীন
তোমার রূপের নাহি যে শেষ;
অসীম বিশ্বে শুনি প্রভু শুধু—
তোমার বাঁশীর মধুর রেশ।

আকাশের সীমাহীন নীলিমার রূপে
মেঘ ভেসে যায় বলে চুপে চুপে—
দেখিতে কি পাও তাঁহারই যে আঁখি
চেয়ে রয় অনিমেষ।

[মুস্তাফার কন্যা কোহিনূর একখানি চিঠি লইয়া প্রবেশ করিল। গান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিল। গান শেষ হইলে সে চিঠি দিল।]

কোহিনূর—আব্বাজান! গুরুজীর কাছ থেকে চিঠি এসেছে।

মুস্তাফা—তাই নাকি? দে! দে! (চিঠি পড়িয়া) দেখেছ বিলাওল! বাণীভারতীর শিল্পীদের প্রতি গুরুজীর কি ভালবাসা। এদিকে দাঙ্গা হয়েছে জানার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন এল রিপ্লাইপেড টেলিগ্রাম। আর আজ এসেছে চিঠি,....আপনাদের কোনও ক্ষতি হয়েছে কিনা জানান।

কোহিনূর—সত্যি আব্বাজান—তুই গুরুজীই আমাদের কি যে ভালবাসেন, বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু তোমার ঐ খামখানার মধ্যে যেন আর একখানা চিঠি আছে মনে হচ্ছে!

মুস্তাফা—(খাম দেখিয়া)—তাইত? আমি দেখতেই পাই নি। (চিঠি পড়িয়া সোল্লাসে) বহুত আচ্ছা! বেটী—আবার তৈরী হতে হবে। এবার নূতন নূতন জায়গায় অভিযান।

(বিলাওল মুস্তাফার হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িতে লাগিল।)

কোহিনূর—(সাগ্রহে)—নূতন নূতন জায়গা! বেশ কথা—

দেখি কোথায় (বিলাওলের হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িতে লাগিল)।

বিলাওল—আমি ত এর মধ্যে আনন্দের কথা কিছু দেখলাম না।

মুস্তাফা—সে কি!—আনন্দের কথাই ত। নিরানন্দের কি দেখলে চিঠিটার মধ্যে?

বিলাওল—আপনাদের দিয়ে কম পয়সায় খাটিয়ে নেবার মতলবই ত মনে হয় চিঠিখানা পড়ে। এতেও যদি নিরানন্দের কিছু না থাকে তবে—

কোহিনূর—কি বলছেন আপনি?

বিলাওল—ঠিকই বলছি। আসামের দাঙ্গা-পীড়িতদের পুনর্বাসন হোক বা না হোক তাতে আপনাদের কি? বিহারের বন্যার্তদের জন্যই বা আপনাদের এত মাথা ব্যথা কি যে তার জন্য সামান্য মজুরী নিয়ে খেটে দিতে হবে?

কোহিনূর—মজুরী বলবেন না। গুরুজী বলেন মজুরী বললে শিল্পীর অপমান করা হয়। শিল্পীর পারিশ্রমিক কেউ দিতে পারে না। সেইজন্য গুরুজী বলেন দক্ষিণা। দক্ষিণা কিছু কম বা বেশীতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

মুস্তাফা—ঠিক বলেছিস বেটী। আমরা ব্যবসা করি না। আমাদের কাজ হল দেশকে তার সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া। তার জন্য আমরা মজুরী নেবে কেন?

বিলাওল—দেখুন, আপনাদের এই অদ্ভুত কথার মানে বুঝি না। আপনারাও হিন্দুদের সঙ্গে থেকে থেকে হিন্দুই হয়ে

গেছেন। আপনারা বলেন—গুরুজী, দক্ষিণা, শিল্পী—এসব কথা বলা কি ঠিক?

মুস্তাফা—বেঠিকের মত ত কিছুই নেই বিলাওল। আমাদের ধর্ম আলাদা, কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীরই ধর্মনির্বিশেষে সংস্কৃতি এক। আমরা সংস্কৃতির পূজারী—কাজেই আমাদের চিন্তা এবং কথার ধরণ একরকম।

বিলাওল—কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতি আর মুসলিম-সংস্কৃতি কিছুতেই এক নয়—একথা আপনি মানেন না?

মুস্তাফা—না।—তুমি গোড়াতেই ভুল করছ। দেশভেদে সংস্কৃতি ভিন্ন হয়—ধর্মভেদে হয় না। আরবের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের মুসলমানদের মিল কতটুকু। কিন্তু ভারতের হিন্দুদের সঙ্গেই একত্রে সে গড়ে তুলেছে ভারতীয় সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সবকিছু। বিলাওল—তুমিও ত একজন সঙ্গীত শিল্পী, তুমি কি সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দু আর মুসলিমের দান আলাদা করে ফেলতে পার?

বিলাওল—সঙ্গীত মুসলমানের সৃষ্টি।

কোহিনূর—তাহলে রাগ-রাগিণীগুলোর নাম সংস্কৃত ভাষায় বলা হত না। তাদের বর্ণনা অমন সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে আমরা পেতাম না। তবে ভারতে মুসলমান আসবার পর তাদের দানে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ভারতীয় সঙ্গীত।

মুস্তাফা—তুমি কি বলতে চাও বিলাওল তাজমহল গড়তে

কোনও হিন্দু স্থপতির দরকার হয়নি? এদেশে যে সব মুসলিম সংস্কৃতির চিহ্ন আছে তাতে কোনও হিন্দুর দরকার হয়নি? বাদশাহ আকবর একথাটি বুঝেছিলেন বলেই তাঁর নবরত্ন সভায় হিন্দু-মুসলিম গুণীদের একত্র করেছিলেন।

বিলাওল—দেখুন, তর্ক করলে অনেক কথা উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক আমরা কি দেখি? আমরা দেখি হিন্দু এবং মুসলমান আলাদা এবং কখনও মিলতে পারে না। তার প্রমাণ আজও ভারতে দাঙ্গা হয়।

কোহিনূর—দাঙ্গা আজও হয় তার কারণ ভারতবাসী তাদের সংস্কৃতিকে ভুলেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লোকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন পরিচ্ছদে নিজেদের সাজায় বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের উপাসনা করে—কিন্তু যে কাজে সংস্কৃতির পরিচয় তার ধারা সর্বদাই এক। সঙ্গীত, নৃত্য, বিদ্যাচর্চা, দর্শন, অনুশীলন, স্থাপত্য—এই সবই সকলের মিলিত এক সর্ববাদীসম্মত ধারায় বয়ে চলে। গুরুজী কেতন বলেন, লোকসঙ্গীত, লোকসংস্কৃতিও যে কত মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ বাঙলা দেশে একটা পূজা হত—তার নাম হল সত্যনারায়ণের পূজা—কিন্তু তাতে যে পাঁচালী পড়া হত তার নাম ছিল সত্যপীরের পাঁচালী। তাতে প্রধান নৈবেদ্য হিসাবে যে উপকরণ দেওয়া হত তার নাম ছিল সিন্নি। সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি অবশ্য আস্তে আস্তে এই মিশ্রিত লোকধর্ম

লোপ করে দিয়েছে। গুরুজী বলেন এই মিলিত সংস্কৃতি আবার যখন দেশবাসী উপলব্ধি করবে—সেদিন ভাষা নিয়ে গোলমাল থাকবে না—ধর্ম নিয়ে রক্তপাত থেমে যাবে—প্রাদেশিকতা লোপ পাবে। সেইজন্য আমাদের এই দলের নাম হল বাণীভারতী।

বিলাওল—আচ্ছা, আমাকে নিতে পারেন আপনাদের দলের মধ্যে।

মুস্তাফা—তোমার মত একজন তবলাবাদককে বাণীভারতী আগ্রহের সঙ্গে টেনে নেবে। তাহলেও একবার গুরুজীর অনুমতি নেওয়া দরকার।

কোহিনূর—বেশ ত, আপনি যদি সত্যই আমাদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা করেন, তবে গুরুজীকে লিখে আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু আমাদের বাণীভারতীর প্রতিজ্ঞাপত্র কি দেখেছেন আপনি ?

বিলাওল—সে দেখে নেওয়া যাবে। তোমাদের কথা শুনে আমার খুব আগ্রহ হয়েছে তোমাদের দলের সঙ্গে কিছুদিন থাকবার জন্য। ওস্তাদজী! আপনি ব্যবস্থা করুন।

কোহিনূর—আমাদের দলে থাকতে হলে আপনার অনেক সংস্কার ভুলতে হবে। ধর্ম থাকবে আপনার মনে ও ঈশ্বর উপাসনার নিয়মে। কিন্তু ধর্ম নিয়ে বিভেদ-সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের সম্প্রদায়ে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়। উদার মন এবং দেশপ্রেম এই দুইটিই আশা করা হয় সকল শিল্পীর কাছে।

বিলাওল—বুঝলাম সবই। আমি মনস্থির করেছি। আমি বাণীভারতীতে যোগ দিতে চাই।

মুস্তাফা—বেশ ত! বেটী তুই গুরুজীকে লিখে একটা ব্যবস্থা করে ফেল। আমরা এবার যাবার সময় যেন বিলাওলকে নিয়ে যেতে পারি।

(কোহিনূর সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল।)

মুস্তাফা—আর একবার তবলা ধর বিলাওল।

(মুস্তাফা তানপুরা উঠাইয়া জয়জয়ন্তী আলাপ সুরু করিল। পর্দা পড়িল।)

তৃতীয় দৃশ্য

[আসামের একটি সহরের একটা রাজপথ। এক বাড়ীর দেয়ালে এক প্রাচীরপত্র টাঙ্গান আছে। তিনজন লোক—নরেশ্বর, বড়ুয়া, সলিমুল্লা প্রাচীরপত্র পড়িতেছিল। প্রাচীরপত্রে লেখা আছে:—]

বাণী ভারতী

"অসমীয়া ভাইগণ,

আসামের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন। একই সঙ্গে সর্বভারতীয় শিল্পীদের নৃত্য, গীত, অভিনয় প্রত্যক্ষ করুন—আবার দেশসেবাও করুন।"

নরেশ্বর—উঃ কি দুঃসাহস। আমাদের দেশে বসে আমাদেরই দাড়ি ওপড়াবার মতলব ?

বড়ুয়া—না—এ সহ্য করা উচিত হবে না। আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার বাঙালী বসাবার মতলব ? কিছুতেই এ হতে দেওয়া যায় না।

সলিমুল্লা—এ আর কি ? হ্যাণ্ডবিল দেখেছেন ? [পকেট হইতে হ্যাণ্ডবিল বাহির করিয়া পড়িল] ভারতবর্ষের ঐক্য নষ্ট করবার বিকৃত মনোভাব নিয়ে আপনারা যে প্রদেশে প্রদেশে কলহের সৃষ্টি করেছেন তার অবসান হোক। যাদের তাড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টায় আপনারা নিজেদের আত্মাকে অপমানিত করেছেন, তাদের পুনর্বাসন করিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

নরেশ্বর—বড়ুয়া ! এই মডার্ণ যীশুখৃষ্টের দল কোথা থেকে এল হে ? একবার এদের সঙ্গে তাল ঠুকতে হয়।

বড়ুয়া—নিশ্চয় ! আমাদের সঙ্ঘ কখনও এই অপমান চুপ করে হজম করবে না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। কি বল সলিমুল্লা।

সলিমুল্লা—আলবাৎ। এর মধ্যে আবার বলাবলির কি আছে ? আসাম আমাদের। এখানে আর কেউ থাকতে পারবে না—আসতে পারবে না। যদি থাকে, তবে আমাদের গোলামের মত থাকতে হবে। ও সব ভারতীয় ঐক্যের বুলি ফেলে দাও। আসাম—অসমীয়াদের জন্য। ভারতের আর কারও জন্যই নয়।

[কতগুলি হ্যাণ্ডবিল লইয়া কিষণচাঁদ আসিতেছিল, শেষ কথাগুলি তাহার কানে গেল]

কিষণ—ঠিক কথা—আসাম অসমীয়াদের জন্য !

[সকলে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিল]

আসাম, অসমীয়ার—বাঙলা, বাঙালীর—বিহার, বিহারীর জন্য—পাঞ্জাব, পাঞ্জাবীদের জন্য—এমনই সব প্রদেশই দাবী করুক। তাহলে ভারতবর্ষ কার জন্য—আমেরিকা ? চীন ? না পাকিস্তান—না অন্য কোন বিদেশী শক্তির জন্য।

নরেশ্বর—যে যা বলুক আপত্তি নাই, আমরা জানি আসাম অসমীয়াদের।

সলিমুল্লা—ঠিক কথা।

কিষণচাঁদ—আমিও ত তাই বলছি। তবে ভারতবর্ষ কার তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সলিমুল্লা—ও নরেশ্বরদা। এ লোকটা ঐ বাণীভারতীর লোক। ঐ যে হাতে হ্যাণ্ডবিল।

বড়ুয়া—তাই নাকি ? তবে শুনুন মশায়! এসব দুর্বুদ্ধি আপনাদের হল কি করে ?

কিষণ—কি দুর্বুদ্ধি ?

বড়ুয়া—আমাদেরই দেশে বসে আমাদের নিন্দা।

কিষণ—নিন্দা কোথায় দেখলেন ? আপনাদের বিগত আচরণের জন্য অনুতাপ দাবী।

নরেশ্বর—দাবী বুঝিয়ে দেব ! আগে তোমাদের অনুষ্ঠান শুরু হোক।

কিষণ—আজ্ঞে ঐটি করবেন না। সকলে নিন্দা করবে।

সলিমুল্লা—করে করবে—তাতে তোমার কি হে? তোমার বাবার কি হে?

বড়ুয়া—লোকটা বাঙালী নাকি?

কিষণ—আজ্ঞে না।—আপনারা যতই গালাগালি করুন, আমরা কিন্তু দমে যাবার পাত্র নই। এরকমটা হবে জেনেই গুরুজী এখানে আসবার জন্য মনস্থির করেছিলেন।

সলিমুল্লা—তোমার গুরুজীকে আমরা বুঝিয়ে দেব যে সে তপ্ত বালুতে ধান বুনতে এসেছে। ও ধানে যে গাছ হবে না, ফুটে খই হয়ে যাবে একথা তাকে আমরা ভাল করে বুঝিয়ে দেব।

কিষণ—আমি আপনাদের কাছে সবিনয়ে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনারা দয়া করে কিছু সাহায্য দিয়ে বাণী-ভারতীর অনুষ্ঠানটা দেখবেন। তারপর যদি গুরুজীকে কিছু বলবার থাকে তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন।

নরেশ্বর—এ পাগলটা বলে কি হে! আমরা দেশদ্রোহী হব? এদের সাহায্য করে আমরা জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করব?

কিষণ—সাধু! সাধু! দেশদ্রোহী হবেন কেন? আপনাদের জন্মভূমি ত ভারতবর্ষ। ভারতের প্রতি অনুগত হবেন এইত চাই।

বড়ুয়া—দেখ নরেশ্বর! এ লোকটার উকিলের জেরা শুনতে

আমরা চাই না। এরা যে আমাদের অপমান করবার জন্যই এখানে এসেছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

সলিমুল্লা—এখন আমাদের কি করা উচিৎ এ নিয়ে আমাদের সঙ্ঘের একটা সভা ডাকা যাক।

কিষণ—এ সব কষ্ট না করে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখবেন। আচ্ছা, নমস্তে।

[চলিয়া গেল]

বড়ুয়া—লোকটার কথা শুনলে নরেশ্বর—। বেটার দেমাক কত? যেন ওদের অনুষ্ঠান দেখলে আমরা গলে যাব।

সলিমুল্লা—ওসব চালাকী চলবে না হে চাঁদ। আমরা তেমন মাল মশলায় তৈরী নই। বাবা এ হোল পাথর। [বুক ঠুকিল] এই হাতে এবার পঞ্চাশখানা বাড়ীতে আগুন দিয়েছি।

নরেশ্বর—সে কথা যাক। একটা প্ল্যান ঠিক করত। ওরা টাকা আদায় করুক ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐক্যের বুলি আউড়ে যে আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করে ফেলবে বা আবার আসামের মাটিতে বাঙালী বসাবে এ হতে দেওয়া যায় না।

বড়ুয়া—এক কাজ করা যাক। দেখা করবার নাম করে ওদের গুরুজীকে ডেকে আচ্ছা করে ঠুকে দিই।

নরেশ্বর—নাহে অত সহজ নয়। এভাবে মারলে আর যাই হোক—আইনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। ও পথে আর যাওয়া চলে না। [চিন্তিত ভাবে] আচ্ছা অনুষ্ঠান পণ্ড করা যায় না।

সলিমুল্লা—নিশ্চয় যায়। [ভঙ্গী করিয়া দেখাইল] হাত বোমা ছুঁড়ে দেব স্টেজের উপর।

বড়ুয়া—ঠিক যুক্তি!

নরেশ্বর—না না ওভাবে হবে না। প্রথমে গোলমাল সৃষ্টি করতে হবে, তারপর সুযোগ বুঝে বোমা!

সলিমুল্লা—কিন্তু বড়ুয়া-দা। ঐ লোকটা আমাদের চিনে রাখল।

নরেশ্বর—দূর, আমরা কি বোমা ছুঁড়ব নাকি। অন্য লোক দিয়ে ছোঁড়াতে হবে।

বড়ুয়া—তাহলে ত আমাদের টিকিট কিনতে হয়।

নরেশ্বর—তাত কিনতেই হয়। তাতে হয়েছে কি?—

সলিমুল্লা—তাহলে আজ রাত্রেই সঙ্ঘের সভা ডেকে সব ব্যাপারটা অনুমোদন করে নিতে হয়। আমি সকলকে খবর দিতে চললাম।

[চলিয়া গেল]

বড়ুয়া—ও আবার কে আসে?

নরেশ্বর—[নেপথ্যে তাকাইয়া] ওষুধের না বিড়ির বিজ্ঞাপন। না না—ছোট ছোট বই দেখছি হাতে।

[ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে বিচিত্রবেশী সং-এর প্রবেশ, তার হাতে কিছু পুস্তিকা]

সং—বাবু, বই নেবেন বই,—বড় মজাদার বই—মাত্র বার নয়া পয়সা।

বড়ুয়া—কি বই হে?

সং—আধুনিক ভারত। খণ্ডিত ভারত। বড় মজাদার বই।

[নাচিয়া গান ধরিল]

দেশ ত স্বাধীন হল।
অনেক মেহনতের পরে স্বাধীনতা এল।
ও ভাই দেশ যে স্বাধীন হল।
ভারতবাসী একই সাথে লড়াই করেছিল।
একই মায়ের ডাকের জোরে সবাই জুটেছিল
ও ভাই দেশ যে স্বাধীন হল।
তখন ত ভাই কেউ শোনেনাই
ভাষার মারামারি,
রাজ্যগুলি সীমা নিয়ে
করে কাড়াকাড়ি
স্বাধীনতার পরে কি ভাই
এই কুবুদ্ধি এল
ভাইরে দেশ যে স্বাধীন হল।

বড়ুয়া—এই তুমি কি বাণীভারতীর লোক নাকি ?
সং—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি ভারতের লোক।

যে ভারতের সাগরজলে
হাজার জাতের ধারা
মিলে মিশে গলে গিয়ে
এক জাত হল খাড়া

দিগ্বিজয়ী যারা এল
এই ভারতেই মিশে গেল
সেই ভারতের লোক আমি ভাই
আজি লক্ষ্মীছাড়া।

বড়ুয়া—কি আবোল তাবোল বকছ? তোমার ও বই কে কিনবে? তুমি আসল লক্ষ্মীছাড়া।

সং— লক্ষ্মী ছাড়া?

লক্ষ্মীছাড়া একা নই ভাই
সবাই আমার দলে,
নইলে কি আর মারামারি
ভায়ে ভায়ে চলে;
আসাম ঠেঙায় বাঙ্গালীরে
আসাম দেশে বসে।
বাঙ্গলা মারে আসামেরে
হাতের সুখে কসে।
বিহার বলে রাজ্য আমার
হঠ সকল লোক।
পৃথক সুবা হয় না বলে
আকালীদের শোক।
অন্ধ্রদেশ আর মহারাষ্ট্র
চারিদিকে করে রাষ্ট্র—

পৃথক প্রদেশ না হলে ভাই
কেমন করে চলে।
ভাইরে! সবার আমার দলে।

নরেশ্বর—দাও ত একখানা বই। বেশ মজাদার মনে হচ্ছে।

[পয়সা দিল—বই নিল]

সং ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে চলিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

[আসামের পূর্বোক্ত সহরের একটা নাট্যমঞ্চ। প্রেক্ষাগৃহ—দর্শকে পরিপূর্ণ। মঞ্চে পর্দা ঝুলিতেছে—তাহাতে লেখা 'বাণী-ভারতী—আসাম অনুষ্ঠান।" পর্দার সামনে শঙ্করণ আসিয়া দাঁড়াইল।]

শঙ্করণ—অসমীয়া ভাইভগ্নীগণ—আমাদের অভিনয় অনুষ্ঠান আরম্ভ করবার আগে একথা আপনাদের জানাতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সুর আপনারা উপলব্ধি করবেন। আমরা কারও মনে ব্যথা দিতে আসি নাই। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে এসেছি তার যথাযথ রূপ আমরা দিতে পারব কিনা জানি না। অক্ষম যদি হই, তবুও আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে নিতে আপনারা সক্ষম হবেন—এই ধারণা নিয়েই এই অনুষ্ঠান।

[প্রস্থান]

[যবনিকা উঠিল—বাণীভারতীর শিল্পীগণ অভিনয় করিতেছেন। যুগ্ম নৃত্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী জাতীয় পতাকা অভিবাদন করিল। মঞ্চ অন্ধকার হইল—আবার আলো জ্বলিল। নেতা ও তাহার স্ত্রী সরলা। নেতা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে পদচারণা করিতেছিল।]

নেতা—এ তুমি কি বলছ সরলা—আমার দাবী অযৌক্তিক ?

সরলা—হ্যাঁ, আমি তাই বলছি। তোমার এই অভিযানের ফল কি হবে জান ? আমাদের আশেপাশের তিনটি প্রদেশেই বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠবে। সবাই যদি নিজ নিজ প্রদেশের সীমা বাড়াতে চায়, তবে তার পরিণতি কি হবে তা ভেবে দেখেছ ?

নেতা—ওসব অনেক ভেবেছি। আমি কেন দাবী করব না ? স্বাধীনতার যুদ্ধে কি আমার প্রদেশ সৈনিক হিসাবে কাজ করে নাই ? আমার প্রদেশবাসীরা কি প্রাণ দেয় নাই স্বাধীনতার যজ্ঞ বেদীমূলে ?

সরলা—দিয়েছে।

নেতা—আমার প্রদেশের লোকেরা চায় পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা। এ দাবী কেন তারা করবে না ? তাদের প্রদেশের নেতা কেন কেন্দ্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে গণ্য হবে না ?

সরলা—এক পরিবার যদি বহু সভ্য নিয়ে গঠিত হয় আর প্রত্যেক সভ্যই যদি তাদের সুখ, সুবিধা, আরাম-বিরামের চুলচেরা হিসাব করে, তবে সে পরিবার ভেঙে

পড়ে। আর প্রত্যেকেই যদি প্রয়োজন মত ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে তবে সেই পরিবারে বাস করা সুখের হয়ে ওঠে।

নেতা—তোমার এসব যুক্তি আমার অভিযান বন্ধ করতে পারবে না। আমি আর দুইদিন পর্যন্ত আমার চরম পত্রের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করব। তার পরেই আমার সত্যাগ্রহী দল নিয়ে আমার প্রদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে যতদূর পর্যন্ত আমাদের ভাষার অস্তিত্ব পাব ততদূর পর্য্যন্ত দাবী করব। এর জন্য যত রক্তপাত হয় হোক। অতীতেও ত স্বাধীনতার জন্য কম রক্ত দিই নি আমরা।

সরলা—সে রক্ত দিয়েছে মহৎ উদ্দেশ্যে, আর এ রক্ত—

নেতা—নীচ উদ্দেশ্যে?—ছি—ছি—ছি সরলা! স্বাধীনতার সংগ্রামে তোমার ত্যাগ স্বীকার দেখে—আর নির্য্যাতন বরণ করা দেখে তোমাকে সহধর্মিণীরূপে টেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজ দেখছি তোমার অধঃপতন ঘটেছে।—যাক—। ঐ যে পূরণ এসে পড়েছে—এবার তুমি যাও।

[সরলার প্রস্থান ও পূরণের প্রবেশ]

কি পূরণ সংবাদ কি?

পূরণ—সংবাদ ভাল—আমরা প্রথম অভিযানে পাঁচশ সত্যাগ্রহী নিয়ে অভিযান করবার মনস্থ করেছি। অপর প্রদেশেও শুনেছি প্রস্তুত হয়েছে। সীমানা-নির্ধারণের সময় লাঠালাঠিও হতে পারে।

নেতা—তা হ'ক। বড় কাজের জন্য রক্তপাতের ভয় করলে

চলে না। আমাদের সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যেন বেশ কিছু ছোরা ও তলোয়ার থাকে।

পূরণ—সে ব্যবস্থাও করেছি।

[বেগে ভৃত্য রতনলালের প্রবেশ]

নেতা—কি রতন ?

রতন—সংবাদ বড় ভয়ানক হুজুর। সীমানাতে হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলছে। বড় বড় বাড়ীতে আগুন দিচ্ছে।

নেতা—পূরণ,—তুমি ভালভাবে খোঁজ নাও—কোন দিকে বেশী ক্ষতি হচ্ছে। যদি আমাদের দিকে বেশী ক্ষতি হয়—কেন্দ্রীয় সরকারকে টেলিগ্রাম কর। রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে টেলিগ্রাম কর। আর যদি ওদের দিকে বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে তবে চুপ করে থাক।

পূরণ—আমি সব ব্যবস্থাই করছি। রাত অনেক হয়েছে। আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন। কাল আবার তিনটে সভায় বক্তৃতা করতে হবে। এসব ব্যবস্থা আমরাই করতে পারব। আচ্ছা চললাম নমস্কার। [চলিয়া গেল]

নেতা—রতন তুইও যা। [রতনের প্রস্থান]

ঘুম! ঘুম আজ আর আসবে না। একটু ঘুমের ঔষধ খেয়ে নিলে হয়। তাহলে কাল মাথাটাও সাফ থাকবে। [ঘুমের ঔষধ খাইল] ঘুম না আসা পর্যন্ত কালকের বক্তৃতার খসড়া করি।

[কলম লইয়া টেবিলে লিখিতে বসিল—কিছু লিখিল—

আবার হাই তুলিল। পরে কলম রাখিল এবং টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া পরক্ষণেই নীলাভ আলো জ্বলিয়া উঠিল। একটি মূর্তির আবির্ভাব হইল—স্বামী বিবেকান্দ! ছবিতে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনই।]

নেতা—কে! কে তুমি?

মূর্তি—চিনতে পারছ না?

নেতা—হ্যাঁ! স্বামীজী!—স্বামী বিবেকানন্দ।

মূর্তি—হ্যাঁ! আমিই সেই। যার ছবি তোমরা ঘরে ঘরে টাঙিয়ে রাখ, ঘর সাজাবার উপকরণ হিসাবে—আমিই সেই। আজ আমি ঘর সাজাবার অলঙ্কার। আমার ভাব, আমার আদর্শ, শ্রদ্ধার যোগ্য নয়—শুধু আমার ছবি টাঙান ফ্যাসান মাত্র।

নেতা—না স্বামীজী! আমরা আপনাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করি। ভারতের ত্যাগী সন্তান আপনি। সর্বজন বরেণ্য বীর। মাতৃভুমির মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান আপনি। আপনি কেন অবজ্ঞার পাত্র হবেন, স্বামীজী?

মূর্তি—বহির্বিশ্বে আমার পরিচয় কি বলে? ভারতের ঐতিহ্য বহনকারী—ভারতের অধ্যাত্ম-শক্তির বাণী প্রচারকারী বলে? না বঙ্গের সন্তান বলে?

নেতা—না, সমস্ত পৃথিবী আপনাকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মূর্ত প্রতীক বলে জানে।

মূর্তি—কোনও দিন কি অন্য প্রদেশবাসীর কাছে আমি বাঙ্গালীয়ানা দেখাতে গেছি?

নেতা—না প্রভু!

মূর্তি—ভক্তিতে গদগদ হয়ো না। তোমরা কি করছ তা কি ভেবে দেখেছ কোনও দিন। এই প্রাদেশিকতার সমর্থনে ভ্রাতৃ-রক্তপাত করে ভারতকে খণ্ড খণ্ড করে কি আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হয়। জান, এই ভক্তির ভণ্ডামী আমি কোনও দিন সহ্য করতে পারি না।

নেতা—তবে কি করব প্রভু।

মূর্তি—সারা জীবন ধরে আমার সাধনার কি ফল তোমাদের দিয়ে গেছি? বল উচ্চকণ্ঠে বল—ভারতবর্ষের হৃদয়—আমার হৃদয়—ভারতবর্ষের তপস্যা—আমার তপস্যা, বল মূর্খ ভারতবাসী—পতিত ভারতবাসী—পণ্ডিত ভারতবাসী—সবাই আমার। ভাই। [মূর্তি মিলাইয়া গেল]

[আলো জ্বলিয়া উঠিল—দেখা গেল নেতা টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া আছে। সহসা উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল—উচ্চ কণ্ঠে বলিল।]

নেতা—ভারতবর্ষের হৃদয় আমার হৃদয়—ভারতবর্ষের তপস্যা আমার তপস্যা। স্বামীজী—আমার আদর্শ তুমি—তবে আমি কি করছিলাম। এই অভিযান অন্যায়? বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস—না আর নয়। হে মহামানব। আমায় পথ দেখাও—আমি এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করি। রতন! রতন! [রতনের প্রবেশ]

পূরণকে সংবাদ দে এখনি—এই মিথ্যা অভিযান বন্ধ করতে হবে—সরলা—সরলা—

[সহসা প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের মধ্যে কলরব শোনা গেল— "শুনব না—শুনব না"—"আমাদের অপমান"—"নামিয়ে দাও"। নরেশ্বর দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিল—"থাম, থাম, ভাই সব—আমি তোমাদের দলপতি, আমি বলছি।" কিন্তু গোলমাল চলিতে থাকিল—মঞ্চ হইতে অভিনেতৃগণ চলিয়া গেল—নরেশ্বর লাফাইয়া মঞ্চে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। ধোঁয়ায় মঞ্চ ভরিয়া গেল—ধোঁয়া সরিলে দেখা গেল নরেশ্বর চেয়ার ধরিয়া দাড়াইয়া আছে— তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সাদা জামার স্থানে স্থানে রক্তের ছাপ লাগিয়াছে। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল]

নরেশ্বর—থামুন :সকলে। আমার দলের ভাইসব তোমরা থাম। [দর্শকবৃন্দের গোলমাল থামিল]

—সহৃদয় দর্শকগণ—অসমীয়া ভাইসব, আজকের এই গোলমাল সৃষ্টির মূল দায়িত্ব আমার। কারণ যে দল এই গোলমাল সৃষ্টি করেছে তার দলপতি আমি নিজে। সম্প্রতি যে দাঙ্গা হয়ে গেল তারও একটা বড় অংশের দায়িত্ব আমার। স্বামী বিবেকানন্দকে অমি ভক্তি করি— তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর বাণী এমনভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা আমি কখনও করি নাই। আজ বাণী-ভারতীর এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর উপদেশ আমার কাছে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। তারই প্রভাবে বুঝতে পারছি, কত বড় পাপ—কত বড় অন্যায় আমরা করেছি। আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ তার

অঙ্গচ্ছেদ করে আমরা জন্মভূমির প্রতি অত্যাচার করতে চলেছি। তাই আজ অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দাঙ্গা পীড়িতদের পুনর্বাসন প্রচেষ্টার দায়িত্ব মাথা পেতে নিলাম। আমার এই নিজের দোষে প্রবাহিত রক্তধারা যেন বিফল না হয়। সমস্ত অসমীয়া এবং বাঙালী ভাইদের কাছে এই নিবেদন।

[কেতন ও শঙ্করণের প্রবেশ—কেতন নেতার রূপ-সজ্জা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে]

কেতন—না ভাই—বীরের রক্তস্রোত বিফল হয় না। তোমার রক্তের তিলক কপালে এঁকে তোমার দলের সকলে প্রতিজ্ঞা করবে—ভারতীয় ঐক্যের জন্য ভারতের বিভেদ-কামী শক্তিকে ধ্বংস করবার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তুমি আহত—তুমি এইখানে বস।

[নরেশ্বর চেয়ারে বসিল]

শঙ্করণ—সার্থক আমাদের এই শিল্পসৃষ্টি, সার্থক আমাদের এই চেষ্টা। উঠে এস ভাই সব। তোমাদের দলপতির পথ অনুসরণ করে উঠে এস মঞ্চে—প্রতিজ্ঞা কর দলপতির মত—

[সলিমুল্লা ও বড়ুয়া মঞ্চে উঠিয়া আসিল—কোহিনূর—কিষণচাঁদ—সুলতানা মঞ্চে প্রবেশ করিল। কোহিনূর সলিমুল্লা ও বড়ুয়ার হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল—]

কোহিনূর—প্রিয় ভাইসব—আজ তোমাদের হাতে বাণী-ভারতীর রাখী পরিয়ে দিলাম। বাণীভারতীর প্রচেষ্টা তোমাদের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা লাভ করুক।

[শঙ্করণ ও কেতন পুরোভাগে দাঁড়াইল আর সকলে পাশে ও পিছনে দাঁড়াইল]

কোহিনূর গাহিল—

সহনা ববতু সহনা ভূনক্তু
সহবীর্যং কর বাবহৈ—

বিরাম

পঞ্চম দৃশ্য

[উদ্যান। জ্যোৎস্নার আলোতে বড় সুন্দর দেখাইতেছে। কোহিনূর এবং ফাল্গুনী বসিয়া আছে।]

ফাল্গুনী—ওরে চাঁদ! পৃথিবীটাকে যেন মায়ার রাজ্য করে তুলেছিস—তোর আলোর রং-এর তুলি বুলিয়ে। তবু যদি ধার করা আলো না হত।

কোহিনূর—ধার করাই হোক, আর নিজস্বই হোক—ওর রহস্য হল অন্য খানে। সূর্য্য তার আলোর ছুরি চালিয়ে যা অপ্রকাশ তাকে সকলের সামনে খোলা মেলা করে আর চাঁদ তার আলোর পাতলা ওড়না দিয়ে আধোঢাকা করে দেয় পৃথিবীকে।

ফাল্গুনী—সব জিনিসেই কি অপ্রকাশ হলে ভাল লাগে ?

কোহিনূর—নিশ্চয়ই। মানুষের মন এত রহস্যময় কেন বুকের পাঁজরের নীচে ঢাকা থাকে বলে।

ফাল্গুনী—কিন্তু বুকের পাঁজরের আড়ালে লুকানো মনটিকে দেখবার বড় দরকার হয়েছে যে।

কোহিনূর—কেন মনেব ডাক্তার হয়েছ নাকি ?

ফাল্গুনী—ডাক্তার হলে হতই। রোগী হয়েছি কিছু দিন থেকে।

কোহিনূর—বেশত ডাক্তারের কাছে যাও না।

ফাল্গুনী—মনের ডাক্তার কি যেখানে সেখানে মেলে ?

কোহিনূর—যেখানে মেলে সেখানেই যাও।

ফাল্গুনী—তাই ত এসেছি রানী। [হাতখানি তুলিয়া লইল]

কোহিনূর—হুঁ। অবস্থা বড় খারাপ। বল কি চিকিৎসা তোমার দরকার।

ফাল্গুনী—তা তো তোমারই জানা। আমি জানি তোমাকে।

(সুরে)—

তোমার চরণে আমার গলায়—লাগিল প্রেমের ফাঁসি।

[ঝোপের অন্তরালে বিলাওলের মুখ দেখা গেল]

কোহিনূর—[নিরুত্তরে অধোবদনে রহিল]

ফাল্গুনী—উত্তর পাব না ?

(সুরে)—

একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়।

কোহিনূর—উত্তর দেবার কি আছে? তুমি কি অন্ধ, এমন ফুটফুটে চাঁদের আলোতেও দেখতে পাও না।

ফাল্গুনী—রানী [কাছে টানিয়া লইতে গেল। বিলাওল ঝোপের অন্তরাল হইতে গর্জন করিয়া-উঠিল এবং বাহিরে আসিল।]

বিলাওল—কোহিনূর!

[ফাল্গুনী কোহিনূরের হাত ছাড়িয়া দিল—
উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল]

বিলাওল—তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত কোহিনূর!

ফাল্গুনী—লজ্জা! কেন?

বিলাওল—এই গোপন প্রেম কতদিন হল চলছে।

ফাল্গুনী—বেশ কিছুদিন। তবে গোপন প্রেম নয়, পূর্বরাগ। এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল—আর গোপন রাখবার প্রশ্নই নাই।

বিলাওল—তার মানে বুঝলাম না—

ফাল্গুনী—তার মানে ওস্তাদজী আর গুরুজীর অনুমতি নিয়ে আমি কোহিনূরকে বিয়ে করব।

বিলাওল—অসম্ভব!

কোহিনূর—কেন অসম্ভব ওস্তাদ সাহেব? আব্বা কি অনুমতি দেবেন না?

বিলাওল—না।

কোহিনূর—না? আমার ত মনে হয় দেবেন। বেশ আজই এর ফয়সালা হয়ে যাক। আমি আব্বা ও গুরুজীকে ডেকে আনি। [প্রস্থান]

বিলাওল—ওস্তাদ! তুমি কি কোহিনূরকে সাদী করতে চাও।

ফাল্গুনী—তা কি তোমার বুঝতে বাকী আছে, ওস্তাদ?

বিলাওল—তুমি এ আশা ছাড় ওস্তাদ! তা না হলে তোমার ভাল হবে না।

ফাল্গুনী—ভাল হবে না কেন? ভাবে মনে হচ্ছে তোমারও কোহিনূরের দিকে নজর আছে।

বিলাওল—তওবা—তওবা। আমার জনানী আছে। সে কথা নয়। তবে তোমাকে বলছি, এ হতে পারে না।

[মুস্তাফা, কেতন, শঙ্করণ, কোহিনূর ও সুলতানার প্রবেশ]

মুস্তাফা—কেন হতে পারে না, বিলাওল?

বিলাওল—আপনি সব শুনেছেন?

মুস্তাফা—হ্যাঁ সব শুনেছি—আগেও কিছু কিছু এর আভাস পেয়েছি।

বিলাওল—এসব জেনেও অপনি বাধা দেন নাই বা আজও বাধা দেবেন না।

মুস্তাফা—কেন বাধা দেব। ফাল্গুনীর মত পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা। তুমি কি জান যে ও উচ্চশিক্ষিত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তারপর উঁচুদরের গায়ক এবং সেতার-বাদক। শিল্পী হিসাবে মাঝে মাঝে বাণীভারতীর সঙ্গে যোগ দেয়। এবার গুরু কেতনের নূতন প্রচেষ্টায় উৎসাহ বোধ করে কলেজের ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘুরছে। আমি বরং কোহিনূরের প্রশংসাই করব যে সে যোগ্য পাত্রে মন সমর্পণ করেছে।

বিলাওল—যোগ্য পাত্র আপনি কাকে বলেন ?

শঙ্করণ—তোমার কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কেন এত আপত্তি করছ ?

বিলাওল—[এবার চাপা উত্তেজনা কথায় প্রকাশ পাইল] আপত্তি করব না ? আপনারা না বুঝতে পারলেও ওঁদের দুইজনেরই বোঝা উচিত ছিল। [মুস্তাফা ও সুলতানাকে দেখাইল] কাফে—মানে হিন্দুর হাতে আপনার বেটীকে তুলে দেবেন।

মুস্তাফা—ছি-ছি-ছি বিলাওল! শেষ পর্যন্ত তোমার মুখে এই কথা এল।

কেতন—ওস্তাদ! সংস্কৃতির উপাসক তুমি। তোমার মন পাখা মেলে উপরে উঠবে। দেখ, জমি যে আল দিয়ে ভাগ করা থাকে ওসব নজরে পড়ে যতক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে আছ। এরোপ্লেনে উঠে নীচের দিকে তাকালে মনে হয় সব একাকার। মনটাকে উপরে টেনে তোল দেখবে সত্যিকার কোনও ভেদই নাই—সব একাকার।

বিলাওল—[ক্রুদ্ধস্বরে]—উপমা ত দিলেন—কিন্তু কোহিনূরকে সাদী করলে ওর ধর্ম কি হবে ?

কেতন—কার ? কোহিনূরের না ফাগুনীর।

বিলাওল—ধরুন দুইজনেরই।

ফাল্গুনী—আমি উত্তর দিচ্ছি। যার যেমন বিশ্বাস ধর্মও তার তেমনি থাকবে।

বিলাওল—এর মানে ?

ফাল্গুনী—আমরা উভয়ই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আমার ইচ্ছা হয়,

আমি প্রার্থনা ও স্তবস্তুতি করব। কোহিনূরের ইচ্ছা হয় সে নামাজ পড়বে।

বিলাওল—এ আজগুবি কথা—এর কোনও মানে হয় না।

কেতন—খুব হয়। আচ্ছা ওস্তাদ। তোমাকে ত কখনও নামাজ পড়তে দেখি না। তবে ধর্ম ধর্ম করে তোমার এত আগ্রহ কেন?

বিলাওল—আমি ইসলামে বিশ্বাসী। নামাজ না পড়লেই যে ধর্ম হবে না এর কোনও অর্থ নাই।

শঙ্করণ—যাক, এসব বাজে কথা। ফাল্গুনী এবং কোহিনূর পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। এই জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের পথ স্থির করে নিয়েছে। তারা দুজনেই শিক্ষিত ও পূর্ণবয়স্ক—এবং মনের পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিল্পী। এ অবস্থায় তাদের ইচ্ছাপূরণে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

বিলাওল—ওস্তাদজী! এ বিষয়ে আপনারও কি এই মত?

মুস্তাফা—নিশ্চয়।

বিলাওল—কিন্তু আমি বলছি ফাল্গুনী ইসলামধর্ম গ্রহণ না করলে এ সাদী হতে পারে না।

মুস্তাফা—খুব পারে। আমরা ধর্মকে অত ঠুনকো জিনিষ মনে করি না। ফাল্গুনী আগেই তাদের ধর্মমত জানিয়েছে।

বিলাওল—[সুলতানার প্রতি] আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন? আপনি অন্ততঃ প্রতিবাদ করুন—হিন্দু আর মুসলমান কোনদিন মিলতে পারে না।

সুলতান—পারে। এই আমাদের বাণীভারতীর শিল্পীদের

মুখে কোনদিন আমি হিন্দু, আমি মুসলমান এ সব শুনেছেন। অথচ ওস্তাদজী, আমি, কোহিনূর সবাই পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ি। দুই গুরুজীই রীতিমত পূজার্চনা করেন। কোনও দিনই ত সংঘর্ষ হয় নাই। কাজেই আমি অন্যায় বাধা দিতে যাব কেন?

বিলাওল—বুঝেছি আপনারা ধর্মদ্রোহী। কিন্তু আমি ত চুপ করে থাকতে পারি না। আমাকে এই বিয়ে বন্ধ করতেই হবে।

কোহিনূর—এ ব্যাপারে আমার কথা বলা ভাল দেখায় না। তবুও আপনাকে মনে না করিয়ে পারছি না। এ সম্প্রদায়ে যোগ দিবার সময় আপনি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

বিলাওল—সে প্রতিজ্ঞার এ মানে নয় যে, কেউ ধর্ম ও সমাজের বিরোধিতা করলে বাধা দেব না।

শঙ্করণ—দেখ ওস্তাদ! অযথা এই বাগ-বিতণ্ডায় আমাদের সুখী সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রীতিকর ব্যাপার টেনে আনছ?

বিলাওল—না, এ আমি সহ্য করতে পারব না। এর জন্য যদি বাণীভারতীর সংশ্রব ছাড়তে হয় তাও স্বীকার। আমি বিশ্বাস করি, ধর্মভেদেই মনের ভেদ হয়, জাতির ভেদ হয়। হিন্দু এবং মুসলমান কখনই মিলাতে পারে না।

শঙ্করণ—ওস্তাদ! তুমি খুব উত্তেজিত হয়েছ। আপাততঃ নিজের ঘরে যাও। পরে আমার সঙ্গে সমস্ত বিষয় বেশ ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করলেই আশাকরি কোন গ্লানি থাকবে না। সত্যি সব কথা সব সময় বা সব পরিবেশে বোঝা যায় না। আচ্ছা, এস ওস্তাদ! [বিলাওল চলিয়া গেল

মুস্তাফা—ওর মত হয়ত বদলাবে না। ওর মত লোক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে বলে এখনও দাঙ্গা হয়—ঝগড়া হয়। যাক, গুরুজী। এবার আপনারা বিবাহের জন্য একটা দিন স্থির করুন।

কেতন—[শঙ্করণকে]—আমাদের অন্ধ্র এবং দিল্লীর অনুষ্ঠান শেষ হলে আগামী বাসন্তী পূর্ণিমাতে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ফাল্গুনীর সঙ্গে কোহিনূরের বিবাহ সমাধা হবে। কি বলেন গুরুজী। ওস্তাদজী—ফাল্গুনী—কোহিনূর —সকলেরই আশাকরি এতে সম্মতি আছে।

[ফাল্গুনী ও কোহিনূর সকলকে প্রণাম করিল, সকলে চলিয়া গেল—ফাল্গুনী ও কোহিনূর রহিল।]

ফাল্গুনী—[কোহিনূরের হাত ধরিয়া কাছে আসিল] গাহিল,

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলু পিয়া মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।

কোহিনূর—আজি মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজি মঝু দেহ ভেল দেহা,
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটলু সবহু সন্দেহা।

উভয়ে— অব মঝুরব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অল্প ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[অন্ধ্র প্রদেশের একটি সহরের রঙ্গমঞ্চ। প্রেক্ষাগৃহ, দর্শকপূর্ণ মঞ্চে পর্দা ফেলা আছে। তাহার উপর লিখিত—"অন্ধ্রপ্রদেশ অনুষ্ঠান—বাণীভারতী।" পর্দার সম্মুখে কেতন ও ষন্মুখম প্রবেশ করিল।]

কেতন—সমবেত অন্ধ্রবাসী সহৃদয় দর্শকবৃন্দ। আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে আর বেশী দেরী নেই। আপনারা জানেন, আমরা সর্বভারতীয় ঐক্যের বাণী জনগণের কাছে তুলে ধরেছি। আমাদের একজন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীষন্মুখম সম্প্রতি দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই বাণীভারতীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আমাদের অনুষ্ঠানের আগে সে তার বক্তব্য আপনাদের শোনাতে চায়। আমরা হয়ত তার বক্তব্য দর্শকদের সামনে উপস্থিত করতে নাও দিতে পারি। কিন্তু আমবা ভারতীয় সংস্কৃতির নগণ্য সেবক। পরমত সহিষ্ণুতা ভারতের বৈশিষ্ট্য। কাজেই তার মত চাপা না দিয়ে আমরা তাকে বলবার সুযোগ দিচ্ছি। তবে তার মতেব উত্তরে আমাদের যা বলবার আছে তা আমরা অভিনয়াংশেই দেখাব। এর জনা পৃথক উত্তর দিতে হবে না। দর্শকেরা বিচার করবেন কোনটা দৃঢ়—বিভেদ না ঐক্য।

[ষন্মুখমকে আসিবার ইঙ্গিত করিলে সে আগাইয়া আসিল]

ষন্মুখম—হে দ্রাবিড় প্রদেশবাসীগণ!

আমাব বক্তব্য হচ্ছে এই ভারতবর্ষে আর্যগণ আসবার

আগে থেকে দ্রাবিড়গণ এখানে বাস করত। তাদের উন্নত সভ্যতার জন্য আর্যগণের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে তাদের সংঘর্ষ চলেছিল। আর্যগণ দ্রাবিড়দের ঘৃণা করত। তারপর দ্রাবিড়গণ দীর্ঘকাল পরে পরাজিত হয়ে আর্যদের সভ্যতার নিকট নতিস্বীকার করে। তার প্রমাণ তাদের বর্তমান মিশ্র সংস্কৃতি। ভাইসব, আজ আবার অতীতকে স্মরণ করবার দিন এসেছে। আপনারা ভারতীয় ঐক্যের নামে আর্য-সভ্যতার প্রাধান্য স্বীকার না করে পৃথক দ্রাবিড় প্রদেশ দাবী করে আত্মজাগরণের পথ উন্মুক্ত করুন। দ্রাবিড় সভ্যতার পুনরুত্থান করুন। এই আমার নিবেদন।

কেতন—এইবার আমাদের অভিনয় আরম্ভ হবে।

[উভয়ে চলিয়া গেল]

[মঞ্চের যবনিকা ধীরে ধীরে উঠিল। ঋষিপত্নীগণ নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নৃত্যে প্রকাশ পাইতেছে আশ্রমের কাজগুলি যেমন—গো-সেবা—উদূখলে ধান কোটা—অরনি মন্থন করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন—পুষ্প চয়ণ ইত্যাদি। দৃশ্য—বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশ অথবা শুধু একখানা পর্দা। অগস্ত্য প্রবেশ করিল। ঋষিপত্নীগণ চলিয়া গেল।]

অগস্ত্য—হে বিন্ধ্য—হে উচ্চ—হে দুর্গম—আর কতদিন কতদিন —দাঁড়িয়ে থাকবে আমার পথরোধ করে। দাক্ষিণাত্যে যাবার বাসনা দিনে দিনে শশিকলার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। তোমার ওপারে আছে এক সোনার দেশ—তারাও সমৃদ্ধ, তারাও উন্নত। বিন্ধ্য—তুমি আমায় স্তব্ধ করতে পারবে না। আমি যাবই।

[ঋষি পুরুহুতের প্রবেশ]

পুরুহুত—কি ভাবছ অগস্ত্য ?

অগস্ত্য—ভাবছি—বিন্ধ্য কি অনতিক্রম্য ?

পুরু—কিছুদিন থেকে এই অদ্ভুত চিন্তা যেন তোমাকে দংশন করছে। কেন ঐ দক্ষিণে যাবার এত ব্যাকুল বাসনা।

অগস্ত্য—ঐ দক্ষিণী জাতির সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষা।

পুরু—কেন এই আকাঙ্ক্ষা ?

অগস্ত্য—শুনেছি ঐ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীগণ নানা বিদ্যায় নিপুণ। স্থাপত্য, ধাতু-মিশ্রণ, এবং ধাতুময় দ্রব্যাদি নির্মাণে ওরা সুদক্ষ। ওদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখবার আছে।

পুরু—শুধু কি শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ওদিকে যাবার বাসনা ?

অগস্ত্য—না, মিলিব, মিলাব, দিব আর নিব। আমরা আমাদের সভ্যতার অপূর্ব প্রাণশক্তি ওদের মধ্যে সঞ্চার করব। ওরা রাজা নামে একজনকে নিজেদের প্রধান বলে স্বীকার করে, তাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করে সেই রাজার স্বেচ্ছাচারিতা স্বীকার করে নিয়েছে। দাসত্বের বন্ধনে ওরা সমাজের সব কর্মীকে বেঁধে রেখেছে। আমাদের আর্যসভ্যতার এই গণতন্ত্র এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের উদার প্রথা ওদের মধ্যে প্রচার করব। এইটুকু গ্রহণ করে ওদের সভ্যতা আরও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে। কর্মীরা পাবে কর্মের আনন্দ। দাসত্বের ঘৃণিত অত্যাচার সহ্য না করাতে প্রেরণা পাবে নব নব শিল্প-সৃজনে। আমরা

দেব অশ্বারোহণ পদ্ধতি—বিনিময়ে আনব রথ-নির্মাণ কৌশল।

পুরু—এতে আমাদের লাভ কি?

অগস্ত্য—আপাত চক্ষে হয়ত লাভের অংশ কিছুই নাই। কিন্তু আমি দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি পুরুহুত। সেই স্বপ্নে ধরা দেয় সুদূর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ—। দাক্ষিণাত্য মুখরিত হ'য়ে উঠেছে সামগানের উদাত্ত ধ্বনিতে। বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—রাজতন্ত্র ও দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদ করে। আব আর্য্যাবর্তে প্রচারিত হয়েছে নগর নির্মাণের ও বিন্যাসের নূতন কৌশল—ধাতুশিল্পের বিস্ময়কর চাতুর্য—আরও এক অপূর্ব বিষয় হল দাক্ষিণাত্যের সাঙ্কেতিক চিত্র—যার মধ্য দিয়ে তারা মনোভাব ব্যক্ত করে। ঐ সাঙ্কেতিক চিত্র লিখন প্রণালী শিখতে পারলে আমরা আমাদের শ্রুতিকে রেখে যেতে পারব উত্তর পুরুষদের জন্য। পুরুহুত বল দেখি—আমার বাসনা কি অযৌক্তিক। দাক্ষিণাত্যে আমাকে যেতেই হবে।

[মঞ্চ অন্ধকার হইল—আবার জ্বলিয়া উঠিল রক্তিম আলোক। বিন্ধ্য দাঁড়াইয়া—বিন্ধ্য নৃত্যের মধ্য দিয়া আপনার উচ্চতা দুর্গমভাব ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া দর্পভরে দাঁড়াইয়া রহিল।]

অগস্ত্য—হে বিন্ধ্য—দম্ভী তুমি—দর্পী তুমি
দুর্গম—তোমার অরণ্য।
বিপদ সঙ্কুল তোমাকে অতিক্রম করার পথ
আমার মিনতি রাখ
পথের বিঘ্ন দূর কর মোর।

বিন্ধ্য—(পুনরায় দর্পভরে—পদদাপ করিয়া উদ্ধত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—)

অগস্ত্য—জানি তোমার গর্বের উৎস—

হে নগ! উচ্চতায় আকাশেরে করিছ লেহন।
অগম্য অরণ্যকুল বহিতেছ বুকে··· ।
ব্রাহ্মণের মিনতি তাই অবহেলা
কর অনায়াসে।
কিন্তু জেনো স্থির—ব্রাহ্মণ নহেক রিক্ত
যদিও সে দম্ভীনহে বিন্ধ্যাচল মত।
দুশ্চর তপস্যা তার
ভাঙ্গিতে সক্ষম জেনো তব অহঙ্কার।
প্রত্যক্ষ করহ তবে তপস্যার বল।—

[অগস্ত্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিন্ধ্য ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াইতে লাগিল। জানু পাতিয়া ভূমিতে বসিয়া নতশির হইল।]

বিন্ধ্য—ওগো ঋষিবর—

একি বিস্ময়ের ঘোর রেখেছিলে তুমি
উপহার দিতে মোরে।—
দুশ্চর তপস্যার অমিত প্রভাবে—
পরাজিত দম্ভী বিন্ধ্য—
সাধ্য নাহি তার পথরোধ করিবার।
লহ মোর প্রাণের প্রণতি।

অগস্ত্য—সাধু! সাধু!—

রহ নতশিরে—যাবৎ না ফিরি আসি দাক্ষিণাত্য হতে।

দক্ষিণের চন্দনের বাসযুক্ত অপূর্ব মলয়

আর্যাবর্তে বহাইব আমি।

আর্যাবর্ত হতে নিয়ে যাই

নিষ্ঠার মাহাত্ম্য—ত্যাগের মহিমা।

আত্মজ্ঞান মহামন্ত্র। শুনাইব তথা

অমৃতের পুত্র সবে—ঘৃণ্য নহে কেহ।

দাস নহে কেহ। এই বসুধার

সম্পদ সকল—সবে মিলি

করি উৎপাদন—ন্যায্য অংশ.

সবে মিলি করিবে সম্ভোগ।

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

আ যো ধামানি দিব্যানি তস্থু।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং

আদিত্য বর্ণং তমসো পুরস্তাৎ—

তমেব বিদিত্বা নাতি মৃত্যু মেতি

নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

[ধীরে ধীরে তাঁহার কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল—মঞ্চ অন্ধকার হইয়া পুনর্বার আলো জ্বলিয়া উঠিল।]

[কেতনের প্রবেশ]

কেতন—সেই স্মরণাতীত কালে আর্যাবর্ত হতে দাক্ষিণ্যাত্যে গিয়েছিলেন অগস্ত্য এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে মিলনের সেতু

রচনা করতে। তিনি আর ফিরে আসেন নাই। তাঁর সেই চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক অগস্ত্য যাত্রার ফলস্বরূপ আর্য-সংস্কৃতি ও দ্রাবিড় সভ্যতা মিলিত হয়েছিল। যার ফলে আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক দাক্ষিণাত্যজাত দিক্ষণের প্রাণরসে পরিপুষ্ট। ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে দ্রাবিড়ের শিল্পীমন—সূক্ষ্ম রুচিবোধ আর দ্রাবিড়গণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে আর্য্যজনোচিত নিষ্ঠা—জ্ঞান—

[বেগে ষন্মুখমের প্রবেশ]

ষন্মুখম—গুরুজী মার্জনা করুন—আপনার বক্তব্যের উপসংহার আমি করব। সেই যুগে· মহর্ষি অগস্ত্যের তপ প্রভাবে দ্রাবিড়গণ হয়েছে উপনিষদের জ্ঞানের আলোতে ভাস্বর—আর্য্যদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সাহসের স্ফুলিঙ্গ তাদের রুচিবোধ শিল্প বোধকে উন্নততর করেছে। আর ভারতের অন্যান্য অংশ পেয়েছে দ্রাবিড়দের ঐ কলাজ্ঞান। তারই প্রভাবে ভারত সমুজ্জ্বল। আর বিভেদ নয়। আমার চোখের সামনে থেকে ভুলের কুয়াসা দূর হয়ে গেছে। প্রার্থনা করি জগৎ সভায় বরেণ্য স্থান অধিকার করুক। ঐক্যবদ্ধ ভারত।

[কেতনকে প্রণাম করিল—কেতন তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল—।]

সপ্তম দৃশ্য

[আলিগড়ে বাণীভারতী আসিয়াছে। তাহাদের বাণী প্রচারের জন্য। অভিনয় হইবে। তাই তাহারা বাসের জন্য বাসাভাড়া করিয়াছে—সেই বাসার একটি কক্ষ। বিলাওল ও মৌলবী বসিয়া আছে।]

বিলাওল—তা হলে আপনি বলছেন এসব নাচ, গান, অভিনয় ধর্মবিরোধী।

মৌলভী—নিশ্চয়! বিলকুল নাপাক! আপনি কেন এই সব গোণাহের কাজের মধ্যে থাকেন।

বিলাওল—কিন্তু দেখুন। বড় বড় ওস্তাদের বেশীর ভাগই মুসলমান।

মৌলভী—তারা গোণাহ করলে আপনাকেও তাই করতে হবে। তাছাড়া এইসব হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা এও ঠিক কাজ নয়, আপনি এসব ছাড়ুন।

বিলাওল—আচ্ছা সে দেখা যাবে। সে জন্য আপনাকে ডেকেছি তা শুনুন! আমাদের দলের একজন হিন্দুর সঙ্গে ওস্তাদ মুস্তাফার বেটী কোহিনূরের সাদী ঠিক হচ্ছে। কি করলে এ ব্যবস্থা বন্ধ করা যায় তাই বলুন!

মৌলভী—এ হতেই পারে না। এ খুব পাপের কাজ হবে।

বিলাওল—আমিও তাই বলি। (নেপথ্যে দেখিয়া) কে যেন আসছে—চলুন আমরা ঐ বাগানের ভিতর যাই।

[উভয়ে চলিয়া গেল কোহিনূর ও রামভগতের প্রবেশ]

রাম—বহিন তুমি একটু গুরুজীকে বলে দাও না। তুমি বললেই গুরুজী কথাটা ফেলতে পারবেন না।

কোহিনূর—বেশত বলে দেব। কিন্তু তুমি কি ভূমিকা করবে বলত।

রাম—তোমাদের মহড়া দেখে যা বুঝলাম তাতে নানা সাহেবের ভূমিকাটা আমি অনায়াসে করতে পারব।

কোহিনূর—বেশ চমৎকার। কিন্তু নানা সাহেবের ভূমিকায় তোমাকে মানাবে না মনে হয়। তার চেয়ে—

রাম—তার চেয়ে? বেশত তুমিই বলে দাও কোন ভূমিকায় আমাকে মানায়। তবে এবার আমাকে একটা ভূমিকা দিতেই হবে।

কোহিনূর—কেন তুমি ত রোজই কিছু কর। যন্ত্রগুলো ঝাড়া মোছা—সাজান। এ ছাড়া সিপাই সেজে দাঁড়িয়ে থাকা—এ সব ত কম নয়।

রাম—না-বহিন,—এবার আমাকে একটা কথাবলা ভূমিকা দিতেই হবে। আমাকে যে ভূমিকা মানায় তুমি ঠিক করে গুরুজীকে বলে দাও।

কোহিনূর—[চিন্তার ভাণ করিয়া] তোমাকে—তোমাকে চাঁদ-বিবির বাঁদীর ভূমিকায় চমৎকার মানাবে।

রাম—রাম—রাম—আওরতের ভূমিকা? তুমি আমায় ঠাট্টা করছ!

কোহিনূর—না না ঠাট্টা করছি না। কিন্তু আওরতের ভূমিকা শুনেই রাম রাম করে উঠলে—এতে তামাম দুনিয়ার

আওরতের নিন্দা করা হল। আমাকেও নিন্দা করলে। আমি তোমার জন্য কিছু করব না।

রাম—(বিব্রতভাবে) এই দেখ, কি কথার কি মানে করল। আহা, তোমাকে নিন্দা করব কেন! মানে আমি ত আওরত নই—মানে এই কথা—

কোহিনূর—আচ্ছা, রাম ভাই, তুমি বাজনা শেখ না কেন? এত যন্ত্র রোজ নাড়াচাড়া কর। বাজনা শিখলে তোমাকে পায় কে?—

রাম—বাজনা আমি জানি না মনে কর? শোন তবে—

ধাগে থুন্ না
কেটে তাক থুন্ না
তেরে কেটে তাক তাক
তাক তেরে কেটে তাক।

আর গান যদি শুনতে চাও—

কোহিনূর—থাক্ থাক্—জানালা দিয়ে দেখ ত কে লোকটা আসছে?

রাম—(জানালা দেখিয়া) পিঠে কাপড়ের গাঁট—ওটা ত এক ধোপা—।

কোহিনূর—তুমি গান গাইবে শুনেই ও আসছে।— যদি গান গাও তবে তোমাকে ওর বাড়ীতেই পাঠিয়ে দেব।

রাম—(রাগিয়া) তার মানে—তার মানে—আমি গাধার মত গান গাই। এঃ, ভারি ত গান করতে পারেন—তার আবার

এত অহঙ্কার। এ্যাঃ—মিনমিনে গলায়—নাচত! নাচত নন্দদুলাল—কারও ভাল লাগে না শুনতে।

(কেতন হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল)

কেতন—আবার রাম ভগতকে নিয়ে পড়েছ। কিন্তু কার গান কারও ভাল লাগে না রামভগত ?

রাম—ঐ যে ওর (কোহিনূরকে দেখাইল), আবার বলে আমায় ধোপা-বাড়ী পাঠাবে।

কেতন—কেন, তুমি কি ময়লা জামা যে, তোমাকে ধোপা-বাড়ী পাঠাবে ?

রাম—না—না, আমি যদি গান গাই—তার মানে—

কেতন—ওঃ! এই কথা—এ তোমার খুব অন্যায় কোহিনূর। রাম গান জানে না—তবে নাচতে জানে—বাজনা জানে।

রাম—(কোহিনূরকে) এবার শোন গুরুজীর কথা। এঃ! ভারি অহঙ্কার। তাও যদি গলা আওরতের মত না হত—।

কোহিনূর—আওরতের গলা কি পুরুষের মত হবে? তুমি যেমন বোকা—এই জন্যই গুরুজী তোমাকে কোন ভূমিকা দেন না।

রাম—ও হোঃ! দেখ আসল কথাই ভুলে গিয়েছি গুরুজী—। মানে বহিন তুমিই বলে দেও না গুরুজীকে—

কোহিনূর—কেন বলব! তুমি আমাকে গালি দাও।

রাম—না না—এই কানমোলা খাচ্ছি।

কোহিনূর—আচ্ছা বলছি! রাম চাঁদবিবির ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়।

কেতন—(উচ্চহাস্য)—তা বেশ বেশ।—

রাম—(রাগিয়া) তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।

(সুলতানার প্রবেশ)

সুলতানা—গুরুজী! নূতন অভিনয়ের এক জায়গা দেখিয়ে দিতে হবে।

রাম—(সুলতানার নিকট যাইয়া)—এ বড়ী বহিন! তুমি বল ত আমি নাচতে জানি কি না?

সুলতানা—আলবৎ জান।—আমি নিজে তোমাকে শিখিয়েছি।

রাম—(কোহিনূরের প্রতি) শুনলে ত!

কোহিনূর—বিশ্বাস করি না।

সুলতানা—রাম ভাই! একবার একটা নাচ দেখিয়ে দাও না। ও ছেলেমানুষ। একবার দেখলেই বিশ্বাস করবে।

রাম—তবে ত পোষাক বদলাতে হয়।

সুলতানা—না না, পোষাক বদলে কি হবে! এমনিতেই দেখাও। ঐ যে হস্তী-নৃত্য। ঐটেই দেখাও।

রামভগত—(হাতকে হস্তী শুঁড়ের ভঙ্গীতে দোলাইয়া কোমর নাড়াইয়া হাস্যকর নৃত্য করিতে লাগিল। চাপা হাসিতে সকলে মুখ তুলিয়া দেখিতে লাগিল। পরে রাম মাহুতের অঙ্কুশ মারিবার ভঙ্গা করিতেই কোহিনূর জোরে হাসিয়া উঠিল। রাম প্রথমে রাগিয়া কোহিনূরের দিকে তাকাইল—পরে সুলতানার প্রতি—)।

রাম—দেখলেন বড়ী বহিন, ওর অহঙ্কার। এ হচ্ছে আপনার শেখান নাচ, আর ও হি-হি করে হাসছে।

সুলতানা—কোহিনূরের খুব অন্যায়। রাম ভাই ঠিক নাচছে। আমি ত ভেবেছি এবার রাম ভাই-এর একটা নাচ দিয়ে দেব।

কোহিনূর—ঠিক কথা—ওকে নানা সাহেবের হাতির ভূমিকা দিলে কেমন হয়?

রাম—(রাগিয়া লাফাইয়া উঠিল) দেখলেন গুরুজী, সকলের আস্কারা পেয়ে ও ছুঁড়ি মাথায় উঠেছে।

সুলতানা—যেতে দাও রাম ভাই। তুমি মাটি কাটার নাচটা দেখাও।

রাম—(কোদাল দিয়া মাটি কাটার ভঙ্গী করিতে লাগিল—শেষে হাঁপাইবার ভঙ্গী করিতেই কোহিনূর আবার হাসিয়া উঠিল। মুস্তাফার প্রবেশ)

মুস্তাফা—তাই ত বলি—এমন একটানা হাসি আর কে হাসবে? কি হল বেটি—রামভগতের নাচ! তা ও ত সুলতানার সাগরেদ।

রাম—দেখলেন ওস্তাদজী, সবাই আমায় ভাল বলে, শুধু ঐ রাক্ষসীটাই বলে না। (ফাল্গুনীর প্রবেশ, রাম তাহার নিকট যাইয়া) ওস্তাদ, আপনার কাছে আমার নালিশ আছে একটা—ঐ রাক্ষসীটার একটা শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

ফাল্গুনী—নিশ্চয়! কসে মার লাগাব আমি ওকে। কিন্তু মহড়ার সময় হয়ে গেছে। কাল রাত্রে অভিনয়! তোমরা ত কেউ যাচ্ছ না।

কেতন—হাঁ সবাই চল।

মুস্তাফা—তোমরা সবাই যাও—আমি নামাজ শেষ করে আসি।

(সকলে চলিয়া গেল—মুস্তাফা জাম নামাজ পাতিয়া—নামাজের জোগাড় করিতে লাগিলেন। বিলাওল ও মৌলভী প্রবেশ করিল।)

বিলাওল—ওস্তাদজী—

মুস্তাফা—কে বিলাওল—কি সংবাদ? ইনি কে?

বিলাওল—ইনি একজন মৌলভী—হদিস কোরাণে খুব লিয়াকৎ আছে।

মুস্তাফা—বটে, আদাব জনাব! কিন্তু এখানে কি দরকার বুঝলাম না।

মৌলভী—আপনার জন্যই আসতে হল। বিলাওলের কাছে শুনলাম আপনি কাফেরের সাথে আপনার বেটীর সাদী দিচ্ছেন।

মুস্তাফা—না। কাফেরের সাথে দিচ্ছি না। কাফের মানে নাস্তিক, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ফাল্গুনী ঈশ্বর-বিশ্বাসী—সে নাস্তিক নয়।

মৌলভী—ঈশ্বর-বিশ্বাসী হলেও সে হিন্দু। সে বহু দেব-দেবীকে বিশ্বাস করে।

মুস্তাফা—না মৌলভী সাহেব—হিন্দুরা বহু দেব-দেবী মানে না—তারা বলে সর্বং খলিদং ব্রহ্ম—সব কিছুই সেই ব্রহ্মে অবস্থিত। বহু দেব-দেবীর প্রতীক তারা করে নিয়েছে তাদের মর্জিমত—উপাসনার সুবিধার জন্য।

মৌলভী—ওরা প্রতিমা-পূজক—প্রতিমা-পূজকের সাথে সম্পর্ক রাখতে আমাদের ধর্মে নিষেধ আছে।

মুস্তাফা—না, ওরা প্রতিমা-পূজক নয়। ওরা প্রতিমার মধ্য দিয়ে সেই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে ভজনা করে। দেখেননি ওরা পূজার পর প্রতিমা জলে ফেলে দেয়। প্রতিমা পূজা করলে কি আর জলে ফেলতে পারে?

মৌলভী—যে তর্কই করুন না কেন—তার সঙ্গে আপনার বেটীর বিয়ে দেওয়া চলে—সেই লোকটি যদি ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করে।

মুস্তাফা—আমি এই ব্যাপার নিয়ে কারও বিশ্বাস নষ্ট করতে রাজী নই।

মৌলভী—(রাগত স্বরে) তবে এ সাদী হবে না।

মুস্তাফা—নিশ্চয় হবে।—আমার বেটী—আমি যদি ফাল্গুনীকে ভাল পাত্র হিসাবে মনে করে থাকি তবে কেন হবে না?

বিলাওল—আপনি সমাজকে ফেলতে পারেন না।

মুস্তাফা—সমাজ যদি ভুল পথে চলে—আমি তা চলতে পারি না।

মৌলভী—দেখুন ওস্তাদজী, আপনার কথা বড় দেমাকভরা। আপনি নিজে ঠিক আর সমাজ বেঠিক—এ কথা বলা কত বড় গোস্তাকী তা কি বুঝতে পারছেন না?

মুস্তাফা—আপনারা অযথা আমার ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছেন? আমার নামাজ পড়বার সময় হয়ে গেছে।

মৌলভী—যে ইসলাম অবিশ্বাস করে তার নামাজ পড়বার কোনও দরকার নাই।—

মুস্তাফা—(রাগিয়া) ইসলামে আমি অবিশ্বাসী, না আপনারা ? ইসলামের কি এই অর্থ যে, একই দেশের লোক যার সাথে বহু দিন ধরে বসবাস করতে হবে তার বিরুদ্ধে লোক উস্কে দিয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করা ? এইভাবে দাঙ্গা করে যারা সমাজের শান্তি নষ্ট করে, দেশের শান্তি নষ্ট করে তারা হল ইসলামে বিশ্বাসী—আর যে প্রতিবেশীর সাথে ভাই-এর মত থাকতে চায় সেই হল ইসলামে অবিশ্বাসী।

বিলাওল—হিন্দুর সঙ্গে ভাই-এর মত ব্যবহার করা চলতে পারে না।

(শঙ্করণের প্রবেশ)

শঙ্করণ—তবে কি ব্যবহার করতে চাও, ওস্তাদ ? এই ভারতে আমাদের সকলকেই বাস করতে হবে। ভারতে উৎপন্ন খাদ্যই খেতে হবে। এখানকার কলকারখানায় আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য সব কিছু উৎপন্ন করে ব্যবহার করতে হবে। যদি হিন্দু-মুসলমান ভাই-এর মত, প্রতিবেশীর মত থাকতে না পারে তবে তুমিই বল কে ভারতে থাকবে, আর কে ভারতের বাহিরে যাবে ?

মৌলভী—না, না, না, ভারতেই থাকবে, তবে মুসলমান হিন্দুর থেকে আলাদা থাকবে।

শঙ্করণ—কিভাবে বুঝিয়ে দেন। একটা বিরাট কারখানায় হিন্দু এবং মুসলিম কারিগর কিভাবে কাজ করবে ?

মৌলভী—না, না, সে সব ত একসঙ্গেই করতে হবে, তবে অন্য কিছু এক সঙ্গে চলবে না।

শঙ্করণ—পড়াশোনা—চাষবাস—এসবও চলবে না ?

বিলাওল—দেখুন শঙ্করজী ! আপনারা সকলেই তর্কের এক একজন জালা। তর্ক করে আপনাদের হারান যাবে না। তবে এ কথা ঠিক যে, হিন্দুর সাথে মুসলমান একত্রে বাস করতে পারে না। হিন্দুর সাথে বসবাস করলে আমাদের ধর্মে আঘাত লাগে।

মুস্তাফা—তবে দাঙ্গা কর আর চিল্লাও। এ কি অদ্ভুত মন তোমাদের ? দাঙ্গা করে আর অসন্তোষ জানিয়ে তোমরা এই এত বড় দেশে কিভাবে বাস করবে ?

মৌলভী—আমাদের অধিকার নিয়ে বাস করব, আপনার মত ধর্ম বিকিয়ে গোলাম হয়ে নয়।

মুস্তাফা- দেখ ! রাগ করা আমাদের ধর্মে নিষেধ। আমার নবীও রাগ দমন করতেন। তাই আমিও রাগ করব না। কিন্তু তোমাদের মত মৌলভী এদেশে না থাকলে দেশ শান্ত থাকত।

মৌলভী—দেখুন ওস্তাদজী, আপনার মত মানুষ বেশী থাকলে দুনিয়া থেকে ইসলাম লোপ পেয়ে যেত।

শঙ্করণ—উল্টো কথা বললেন মৌলভী সাহেব। এই রকম লোক এখনও বেঁচে আছেন বলেই সব ধর্মই এখনও মানুষের মধ্যে টিকে আছে' যাক সে কথা। এ নিয়ে অযথা কেন ওঁকে পীড়াপীড়ি করছেন। ওঁর বেটী ওঁর বড়

আদরের জিনিষ, তার সম্বন্ধে উনি যা স্থির করবেন তাই হবে।

বিলাওল—না, তা হবে না। তা হতে দেব না আমরা। এর জন্য যদি আবার দাঙ্গা হয় তাও স্বীকার।

মুস্তাফা—আর নয়, বিলাওল! তুমি আর এ-দলে থেক না। যে মনোভাব তুমি দেখাচ্ছ এর পরেও তোমার এ-দলে থাকার অর্থ হয় না।

শঙ্করণ—না—না, তা হবে কেন—বিলাওলকে কাছে নিয়ে—সকলের মেজাজ ত এক রকম হয়। না, ওস্তাদজী, বিশেষ করে বিলাওলের মনে কিছুতেই কাজটা খাপ খাচ্ছে না, তাই ও এমন বলছে?

বিলাওল—(নিজেকে ছাড়াইয়া)—না শঙ্করজী! আমি সত্যই আর এ-দলে থাকব না। আপনাদের দলে থাকা মানেই আপনাদের গোলামী করা। আমি এ-দল ত্যাগ করাই ঠিক মনে করছি।

মৌলভী—সাচ বাত। এসব নাপাক কাজের মধ্যে যে থাকে সে মুসলমানই নয়। শয়তান।

মুস্তাফা—বেশ ত—তোমরা এখন যাও—আমি নামাজ পড়ব।

বিলাওল—আমরা যাচ্ছি—কিন্তু মনে রাখবেন এ বিয়ে হতে দেব না আমরা—চল মৌলভী সাব।

(প্রস্থান)

শঙ্করণ—(ভাবিত হইয়া) কে জানে, বিলাওল কি করবে ? বড় চিন্তার কথা হল।

মুস্তাফা—কি করবে ওরা—ওদের জন্যই দেশ উৎসন্নে যাবে।

শঙ্করণ—আচ্ছা আপনি নামাজ পড়ুন, আমি শিল্পীদের নূতন নাচটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।

(মুস্তাফা জায় নামাজ পাতিয়া নামাজ শুরু করিল। শঙ্করণ চলিয়া গেল।)

অষ্টম দৃশ্য

[আলিগড়ের একটি রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চে যবনিকা ফেলা, তাহার উপর লিখিত '**বাণী ভারতী—আলিগড় অনুষ্ঠান**'। শঙ্করণ যবনিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

শঙ্করণ—সহৃদয় দর্শকবৃন্দ ! আমাদের অভিনয় ও নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে আমি সামান্য কয়েকটি কথা বলব। আজ ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে এবং ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভেদের ফাটল বড় স্পষ্ট করে চোখে পড়েছে। অনেক চিন্তাশীল লেখক এবং ঐতিহাসিকরাও বলছেন যে, ভারতে কোনদিনই ঐক্য ছিল না, আজও নাই। জোর করে ঐক্য স্থাপন সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা বলব কথাটার গোড়ায় ভুল আছে। প্রাচীনকালে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতকে এক রাজ্যে পরিণত করতে চেষ্টা করে-ছিলেন ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। মহারাজ অশোকও

তাই করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার পথে বহু বাধা ছিল, ভারতবর্ষের বিশালত্ব, যান-বাহন ও যাতায়াতের দুরূহতা। কিন্তু আজ যুগ-পরিবর্তন হয়েছে—বর্তমানে পৃথিবীই এক পৃথিবীতে পরিণত হতে চলেছে। প্রশাসনিক অসুবিধার কোন প্রশ্ন আজ আর নাই—কাজেই সাংস্কৃতিক ঐক্যকে পটভূমিতে রেখে ধর্মসম্প্রদায় ও ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতীয় ঐক্য সম্ভব বলে আমরা মনে করি। ধর্ম নিয়ে দাঙ্গার মূলে আছে কিছু সংখ্যক স্বার্থপর লোকের প্ররোচনা—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আশা করি, আমদের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা আপনাদের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হব।

[প্রস্থান]

(যবনিকা অপসারিত হইল। গ্রামের দৃশ্য—অথবা শুধু একরঙা পর্দা—তিনজন গ্রামবাসীর প্রবেশ)

বসির—বুঝলে সুখন্দর, এবারও আর ভরসা নাই। আমাদের সব জমি এবারেও ডুবে যাবে।

সুখন্দর—কেন এবার ত বেশী বান এখনও আসেনি।

গঙ্গা— বান না এলে কি হবে। সবে আষাঢ় মাস, এর মধ্যেই বসিরের জমিতে জল ঢুকে পড়েছে। সব ধান ডুবে যাবে।

বসির—শুধু কি আমার একার? এ গ্রাম ও গ্রাম—আশেপাশে দশখানা গ্রামের কারও জমি বাদ যাবে না। যতদিন ঐ নবাব সাহেবের জলা আর তেওয়ারীর বিল থাকবে ততদিন আমাদের দুঃখ যাবে না।

গঙ্গা—ঐ জলাছুটোতে ওরা জল আটকে রাখে আর মাছ বিক্রি করে বছরে পায় দশ হাজার টাকারও ওপর। এদিকে ঐ জলার জন্যে অল্প জল এলেই আমাদের ক্ষেতে জল এসে পড়ে। যত দিন যাচ্ছে আর তত আমরা গরীব থেকে ভিখারী হয়ে যাচ্ছি।

সুখন্দর—এর কি কোন প্রতিকার হয় না?

গঙ্গা—হবে কি করে? নবাব আর তেওয়ারী অত টাকার মাছ বিক্রি করে?

বসির—করে ত করে। নবাব আর তেওয়ারীর তহবিলে টাকা গেলে আমাদের কি লাভ? আমরা দশগাঁয়ের সব হিন্দু, মুসলমান এক হয়ে যদি খাল কেটে ঐ বিলের জল নদীতে ফেলতে পারি—তবে সব জমি রক্ষা পাবে। ধান হবে—ছুটো পেট পুরে খেয়ে বাঁচব আমরা।

সুখন্দর—নবাব সাহেব আর তেওয়ারীজী বাধা দেবে না বসির?

বসির—দেবেই ত। আমরা যদি এক সাথে থাকি তবে নবাব আর তেওয়ারীর সাধ্য কি আমাদের ঠেকায়।

গঙ্গা—চল বসির চাচা! আমরা গাঁয়ে গাঁয়ে সভা করে এর ব্যবস্থা করবার জন্য একজোট হই। খাল কাটতেই হবে।

বসির—গঙ্গা ঠিক বলেছে—চল সুখন্দর ভাই, সবাইকে বলি, ভাই সব,—তোমাদের মরা-বাঁচা নির্ভর করছে এই খাল কাটার উপর।

(সকলের প্রস্থান; নবাব সাহেবের ম্যানেজার ফয়জল আলী এবং নায়েব বদরী প্রবেশ করিল)

ফয়জল—শুনলে বদরী—বেটাদের মেজাজের কথা, বেটারা নাকি খাল কাটবে। আমাদের একটা এত বড় আয়ের সম্পত্তির দফা-রফা করে দিতে চায়।

বদরী—হুজুর, বলেন ত লাঠিয়াল দিয়ে দলের সর্দার তিনটের মাথা উড়িয়ে দিই।

ফয়জল—আরে না না—অত সহজ হলে কি এই ফয়জল আলী চুপ করে থাকত। দশ গাঁয়ের লোক যদি একত্র হয় তবে কি আর লাঠির জোরে সায়েস্তা করা যাবে? কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে। ঐ যে তেওয়ারীজী যাচ্ছে, ডাক তো!

বদরী—(ডাকিল) ও তেওয়ারীজী! এদিকে তেওয়ারীজী একবার আসুন।

(তেওয়ারীর প্রবেশ—কপালে ফোঁটাতিলক—মাথায় প্রকাণ্ড টিকি—সজ্জাসজ্জা ধনী লোকের মত)

তেওয়ারী—এই যে ম্যানেজার সাহেব! সেলাম।

ফয়জল—সেলাম, সেলাম—তা এদিকে কি মনে করে?

তেওয়ারী—আরে শুনছি, বসির, গঙ্গা, আর সুখন্দর দশ গাঁয়ের লোক জুটিয়ে খাল কেটে আমাদের জলা থেকে জল বের করে দেবে—তাই আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম

বদরী—ঠিকই শুনেছেন। আমাদের হুজুর সাহেব বলেছেন কৌশলে এটা ঠেকাতে হবে।

তেওয়ারী—খুব সত্যি কথা—তা কিছু বুদ্ধি ঠিক করলেন, আলী সাহেব?

ফয়জল—হুঁ! ঠিক করলাম যে, ওদের দলটা ভাল করে পাকিয়ে উঠতে দেওয়া হোক। আমরা বাধা দেব না। তারপর কাজও আরম্ভ হোক—তখনও আমরা চুপ করে থাকব। এদিকে দুজন লোক—একজন হিন্দু একজন মুসলমানকে টাকা দিয়ে বশ করতে হবে। ওরা খাল কাটার সময় ছুতা করে ঝগড়া বাধাবে। তারপর দুজন দুজনকে ধর্ম তুলে, জাত তুলে কুৎসিৎ গালাগালি দেবে। তারপর এ হিন্দুদের ডাকবে ও মুসলমানকে ডাকবে। ব্যস্, কাম ফতে।

তেওয়ারী—(হাততালি দিয়া) চমৎকার বুদ্ধি—খাল কাটা পাঁচ বছরের জন্য বন্ধ এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

বদরী—কিন্তু হুজুর, যদি সত্যি সত্যিই দাঙ্গা বেঁধে যায়!

ফয়জল—যায় পুলিশ এসে ঠেকাবে—দুচারটাকে গুলি করবে—জেলে নেবে—তাতে আমাদের কি?—কি বলেন তেওয়ারীজী?

তেওয়ারী—(হাত বাড়াইয়া) হাতে হাত দিল আলী সাহেব। এই জন্তই ত লোকে বলে নবাব সাহেব আর কি? যতদিন ফয়জল আলী সাহেব আছে ততদিন নবাবী।

ফয়জল—বলে নাকি! আরে তেওয়ারীজী এ মাথাটা কাজে লাগালে অমন পাঁচটা নবাব হাতে রাখতে পারি। কিন্তু এই যে এত কাজ করি নবাব সাহেব কি সব কিছুর কিস্মৎ দেন? না। যাক সে কথা—। কিন্তু তেওয়ারীজী, আপনার তরফ থেকে খরচার আধা দেবেন আমার তরফে আধা। কি রাজী?

তেওয়ারী—নিশ্চয় দেব। বদরী তুমি দুজন লোভী বদমাইস লোক ঠিক কর। সেবাম আলী সাহেব।

ফয়জল—সেলাম।—আচ্ছা—আবার দেখা করবেন কিন্তু আমার কুঠীতে।

তেওয়ারী—আচ্ছা।

(প্রস্থান)

বদরী—আমিও চললাম হুজুর—লোক ঠিক করিগে।

(মঞ্চ অন্ধকার হইল—আবার আলো জ্বলিল। সারি সারি গ্রামবাসিগণ—কোদাল চালাইয়া খাল কাটিতেছে। নৃত্যের ছন্দে কোদাল চালান দেখান হইবে। বাসর ও গঙ্গা গাহিতেছে।)

জোয়ান—শক্ত হাতে কোদাল ধর—
তোদের বুকের জমাট ব্যথা—
জলের সাথে বাহির কর।
খেটেখুটে ক্ষেতের বুকে।
ফসল দিয়ে ভরিয়ে তুলে
দিসনে তুলে পিশাচ মুখে
রাঙ্গা আঁখির ভয়ে ভুলে।
দশের ভাল যে কাজে হয়—
সাহস করে তাহাই কর—
শক্ত হাতে কোদাল ধর।

(**সহসা একজন চোখ ধরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।**)

১ম—এ হে হে—শালা হারামী—চোখে মাটি ছিটিয়ে দিয়েছে রে।

২য়—এই শালা নেড়ে গাল দিচ্ছিস কেন? শালা গাইখোর।

১ম—চুপ রহ শালা হারামখোর—

২য়–মুখ সামলে কথা বলিস। শালা যেমন গরু খাস তেমনি গরুর মত বুদ্ধি। শালা নেড়ে।

১ম—হারামী কাফের—। চুপ কর না হলে মাথা ফাটিয়ে দেব।

২য়—ঢের দেখা আছে। শালা বদমাসের জাত। তোদের আবার ধর্ম না কিরে? তোদের ধর্মেয় মুখে লাথি।—

১ম—এই শালা কাফের—তোদের পুতুল পূজোর মুখে পেচ্ছাব করি। ভাই মুসলমানগণ, এ হারামী আমাদের ধর্মের নিন্দা করেছে।

(এতক্ষণ গ্রামবাসিগণ কাজ থামাইয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—এবার হঠাৎ একদল চিৎকার করিয়া উঠিল—মার শালা কাফেরকে—অন্যদল চেঁচাইল—মার শালা নেড়েদের। গোলমাল পাকাইয়া উঠিল—চেঁচামেচির মধ্যে বসির। গঙ্গা গোলমাল থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল—দুইজনেই মার খাইয়া সরিয়া গেল। গোলমাল মারামারি সুরু হইল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

(আবার আলো জ্বলিল) ফয়জলের গৃহের একটা কক্ষ। ফয়জল ও তেওয়ারী বসিয়া আছে।)

তেওয়ারী—ম্যানেজার সাহেব। আপনার বুদ্ধিতে খাল কাটা খতম। সত্যি আলী সাহেব, বুদ্ধি ধরেন বটে আপনি।

ফয়জল—আরে, সে আপনাদের দশজন মানেন বলেই। বুঝলেন তেওয়ারীজী, চিরকাল বুদ্ধিমান লোকেরা বোকাদের দিয়ে এমনি করে কাজ হাঁসিল করে এসেছে—এ কি তুমি—!

তেওয়ারী—আসুন আসুন বিবিসাহেবা! কিন্তু একি ?

[একটি ঘোমটা-ঢাকা স্ত্রীলোককে লইয়া রাবেয়ার প্রবেশ]

রাবেয়া—আপনারা একে আটকে রেখেছেন কেন ?

ফয়জল—দরকার ছিল। এসব জমিদারীর ব্যাপারে তুমি কেন ?

তেওয়ারী—ঠিকই—এসব জমিদারীর—।

রাবেয়া—চুপ করুন—আপনারা কি মানুষ না রাক্ষস! এর কাছে শুনলাম—এ হল গঙ্গার বৌ। যাতে দাঙ্গাটা ভাল করে লেগে ওঠে—যাতে গঙ্গা আর বসির শান্তির চেষ্টা ছেড়ে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে, সেজন্যে কৌশলে গঙ্গার বৌকে চুরি করে এনে আটকে রেখেছেন।

তেওয়ারী—বিষয়-সম্পত্তি বজায় রাখতে হলে এসব করতে হয়।

রাবেয়া—না হয় না। সৎভাবে থাকলে এসব না করেও বিষয়-সম্পত্তি রাখা চলে। (ফয়জলকে) যাক, একে লোক দিয়ে গঙ্গার বাড়ীতে পৌঁছে দেবে কি না ?

ফয়জল—সময় হলে দেব।—

রাবেয়া—না এখনই দিতে হবে। যদি না দাও—আমি একে নিয়ে যাব।

তেওয়ারী—না না আপনি যাবেন কেন। সময় হলে আমরাই ব্যবস্থা করব।

রাবেয়া—এখনই নিয়ে যান, আর আপনাকেই এ কাজ করতে হবে।

তেওয়ারী—আমি? সেকি—আমি কেন?

রাবেয়া—হাঁ আপনাকেই নিয়ে যেতে হবে। (ছুটিয়া যাইয়া বন্দুক লইয়া আসিল) আপনি যদি না যান তবে—(বন্দুক তুলিয়া)

তেওয়ারী—(ভয়ে)—এ কি আলী সাহেব—

ফয়জল—আরে রাবেয়া, তুমি কি পাগল হলে?

রাবেয়া—এখনও হইনি। কিন্তু হলে ভাল ছিল। তাহলে তোমাদের এই ভয়ানক কাজগুলো দেখতে হত না। যাই হোক, তেওয়ারীজী, আপনি একে নিয়ে যাবেন কি না—। যদি না যান তবে অনেক হিন্দুই ত মরছে—আপনিও না হয় তার সাথে যোগ দিন— (বন্দুক তুলিল)

তেওয়ারী—যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।

রাবেয়া— গঙ্গার বাড়ী পৌঁছে দেবেন ত? যদি না দেন তবে আমার হাত থেকে রেহাই পাবেন না—এ কথা মনে রাখবেন।

ফয়জল—রাবেয়া—! (ধমক দিল)

রাবেয়া—রাখ আলী সাহেব তোমার চোখ রাঙানি। দরকার হলে তোমার মাথাটাও উড়িয়ে দিতে হাত কাঁপবে না আমার। স্বার্থপর ভণ্ডের দল—

[তেওয়ারী উঠিল। রাবেয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিল]

রাবেয়া—যাও বহিন। বাড়ী পৌঁছে গঙ্গাকে সব কথা খুলে বলবে। আর পৌঁছানোর পর একটা সংবাদ দিও। যদি

দুদিনের মধ্যে সংবাদ না পাই, তবে তেওয়ারীজীকে আমি দেখে নেব। [তেওয়ারী ও স্ত্রীলোকের প্রস্থান]

রাবেয়া—আমি চল্লাম— [চলিয়া গেল]

[আর্দালীর প্রবেশ]

আর্দালী—হুজুর, চারদিকে ভয়ানক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। বহু লোক মারা গেছে—নবাব সাহেব খবর পাঠিয়েছেন যেভাবেই হোক দাঙ্গা থামাতে হবে।

ফয়জল—যা—যা বাচলামো করিস্ না। কি করতে হবে সে আমি বুঝব। যা আমার মৌতাতের সময় হয়ে গেছে—ওষুধটা দিয়ে যা। (আর্দালী ঔষধ ও জল আনিল—ফয়জল খাইল) তুই যা।— [আর্দালীর প্রস্থান]

ফয়জল—হিন্দুর সঙ্গে মিলেমিশে থাকা আর কাজ করা। ফুঃ এখন কি? ঐ কুত্তার বাচ্চা বসিরটা হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যেতে চায়—দেখি ওকে নিকাশ করা যায় কিনা। কাফেরের সঙ্গে কিছুতেই মিলতে দেব না।

[বদরীর প্রবেশ]

বদরী—হুজুর!

ফয়জল—কি?

বদরী—সর্বনাশ হয়েছে হুজুর। ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। অনেক হিন্দু—অনেক মুসলমান মারা গেছে। অনেক মেয়ে, ছেলে হারিয়ে গেছে। খালকাটা বন্ধ করতে গিয়ে কি সর্বনাশ ডেকে আনলাম হুজুর।

ফয়জল—তুমি জাহান্নমে যাও—।

বদরী— কি হুজুর, জাহান্নমে যাব ?

ফয়জল—নয়ত কি ? সামান্য দাঙ্গা দেখে এত ভয়। দু'চারটে কুকুর, শেয়াল মরা দেখে এত ভয়।

বদরী—ঠিকই হুজুর ! আমি ভুল করেছিলাম—ওরা ত মানুষ নয়—শেয়াল কুকুর। ঠিকই না ভয় করব কি ?

ফয়জল—আমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি যাও ঐ বসির আর গঙ্গা, ঐ দুটোকে শেষ করা যায় কিনা দেখ—ওরা এখনও শান্তির চেষ্টা করছে। [বদরী চলিয়া গেল]

[মঞ্চের আলো নিভিয়া নীল আলো জ্বলিয়া উঠিল। আবছায়া স্বপ্নের পরিবেশ। ফয়জল একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। আস্তে আস্তে হাত ধরাধরি করিয়া চারিটি মানুষ প্রবেশ করিল।]

ফয়জল—কে ! কে তোমরা ?

(**মধ্যের মূর্তি**) **নানাসাহেব**—আমরা ইতিহাস।

ফয়জল—সে কি ? ইতিহাস ?

নানাসাহেব—ফয়জল ! ইতিহাস মানুষের ভুল বা নির্ভুল জমা করে রাখে। সে কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। ইতিহাস পড় নাই ফয়জল ? চেয়ে দেখ—আমি নানাসাহেব—আমার ডানদিকে আজিমুল্লা খান, বাঁদিকে তাঁতিয়া টোপী, আহমদ খান।

ফয়জল—তা আপনারা এখানে কেন ?

আজিমুল্লা—তোমাকে ইতিহাস শেখাতে। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস জান ? তোমার মতে যার সঙ্গে মেলামেশা

করা যায় না—সেই হিন্দু নানাসাহেব হ'ল সিপাহী-বিদ্রোহের নায়ক আর আমি মুসলমান আজিমুল্লা খান তাঁর ডান হাত। বাঁ হাত হ'ল তাঁতিয়া টোপী—আর আহ্মদ খান। ফয়জল! ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। অনেক যুগ ধ'রে হিন্দুরা অস্পৃশ্যতার বন্যায় ভারতের ঐক্যবোধ ভাসিয়ে দিয়েছিল—তার ফলস্বরূপ এসেছে ভারত খণ্ডন। আর এখন তোমাদের এই ভুয়া ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ফলে আসবে বৈদেশিক শক্তির ভারত আক্রমণ এবং ভারতের স্বাধীনতার নাশ।

ফয়জল—কিন্তু আমরা কি করব?

নানাসাহেব—যা করছ তার উল্টোটা কর। ধর্ম থাক তোমাদের মনে—সামাজিক আচার-বিচারে। ভাষা থাক তোমাদের মনের ভাব-প্রকাশে—সাহিত্য সৃষ্টিতে—তাই বলে হিন্দু মুসলমানে কেন দাঙ্গা বাধবে। মনপ্রাণ দিয়ে ভাব হিন্দু হই আর মুসলমান হই—আমরা ভারতের লোক—জাতি হিসাবে আমরা ভারতীয়। মনপ্রাণ ভারতের উন্নতির জন্যে এক কর। না হলে এই অন্যায়ের প্রতিফল ভোগ করতে হবে—।

ফয়জল—(ব্যাকুলভাবে) কি করব তবে? কি করতে বল তোমরা? [**গান্ধীজির প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিল—নেপথ্য হইতে সমবেতকণ্ঠে ভাসিয়া আসিল—**

"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
সবকো সম্মতি দে ভগবান।"]

কয়জল—সবই বুঝলাম। কিন্তু ভারতের ঐক্য কোথায়। শুধু কি আমিই দোষী? আকালী শিখরাও ত ধর্মের দাবীতে পাঞ্জাবী সুবা দাবি করছে।

আজিমুল্লা—পাঞ্জাবী সুবা দাবি কি সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের দাবি—না জনকতক তোমার মত স্বার্থপর লোকের দাবি। তারা ভাবে, পৃথক সুবা হলে তারা হবে ক্ষমতার অধিকারী। তার জন্যে তারা শিখদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়। তুমি যেমন সাধারণ লোককে মনে কর শেয়াল কুকুর, তারাও তাই ভাবে। তাদের লিপ্সা মেটাতে তারাও সাধারণের প্রাণ শিয়াল কুকুরের মত বলি দিতে চায়। সত্যি যদি জনসাধারণের এই দাবি থাকত, তবে জালিয়ানওয়ালা-বাগের দৃশ্য আমরা দেখতাম না।—ঐ দেখ—

[নেপথ্যে—জন-কোলাহল—Shoot them. Damn Natives —kill them like dogs···গুলির শব্দ—আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।]

নানাসাহেব—দেখলে এই ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটেছিল। সেদিন পরাধীনতার আগুনের জ্বালা নিবাতে যারা বুকের রক্ত ঢেলেছিল—তাদের মধ্যে শিখ, হিন্দু, মুসলমান সবাই ছিল। বৃটিশ শাসকরা সেদিন শিখদের উলঙ্গ করে বেত মেরেছিল, বুকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শিখরা কি সেই কথা সেই ত্যাগ ভুলে গিয়েছে? না!—পাঞ্জাবী সুবার ধ্বনি জনকতক স্বার্থান্ধ লোকের দাবি। তুমি যেমন তুচ্ছ কারণ নিয়ে দাঙ্গা বাধাও, ওরাও তাই করে।

রাজগুরু শুকদেবের সঙ্গে ভগৎ সিং-ও ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে কি পাঞ্জাবী সুবার আন্দোলন নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্যে। দেশের জন্যে যারা শহীদ হয়েছে তারা এই ভেবেই প্রাণ দিয়েছে যে, দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন ইতিহাসে শুধু একটি কথাই লেখা থাকবে—

"ঐক্যবদ্ধ ভারত"

[নেপথ্যে সমবেতকণ্ঠে ভাসিয়া উঠিল]

পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উজ্জ্বল জলধি তরঙ্গ।

[মূর্তি চলিয়া গেল। আলো জ্বলিয়া উঠিলে দেখা গেল, ফয়জল ইজিচেয়ারে শুইয়া আছে।] [আর্দালীর প্রবেশ]

আর্দালী—হুজুর সাহেব! হুজুর সাহেব!

ফয়জল—(জাগিয়া উঠিয়া চমকিত হইয়া) কে নানাসাহেব!

আর্দালী—না হুজুর, আমি আর্দালী। বদরীবাবু এসেছে।

ফয়জল—যা তাকে নিয়ে আয়।

[বেগে বদরীর প্রবেশ]

বদরী—হুজুর, আর না—সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। কাশিমগাঁয়ের মুসলমান বস্তী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রাজার মহল্লায় একজনও হিন্দু বেঁচে নেই। জনাব আর নয়—এবার থামাতে হবে। খাল কাটা ত বন্ধ হয়ে গেছে।

ফয়জল—ঠিক বলেছ বদরী—খাল কাটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু কুমীর ঢুকে পড়েছে। কি করে ফেরানো যায়। (অস্থিরভাবে) চল বদরী চল। যদি বুকের রক্ত দিয়েও দাঙ্গা থামাতে হয়,

তাই থামাব আমি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

রাবেয়া—(রাবেয়ার প্রবেশ) রাবেয়া, আমি চল্লাম—।

রাবেয়া—কোথায় ?

ফয়জল—যেভাবেই হোক দাঙ্গা থামাতে হবে।

রাবেয়া—আমিও যাব। তোমরা দুজন হিন্দু মুসলমান মিলে যে পাপ করছ, তার আগুনে দেশ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মেয়েছেলের ইজ্জত তোমাদের কাছে ছেলেখেলার বস্তু। চল তোমাদের হয়ে আমি যাব তার প্রায়শ্চিত্ত করতে।

বদরী—বিবি! আপনি পর্দানশীন—আপনি কেন যাবেন।

রাবেয়া—ফেলে দিয়েছি পর্দা—ছুঁড়ে ফেলেছি ভয় ছেঁড়া কাপড়ের মত। ঘরে আগুন লেগেছে—এখন জল ঢালতে হবে। এখন কি পর্দা শোভা পায় ? ভয়ের সময় কি এই ? চল সাহেব, চল বদরী···দেখি ভারত বাঁচে না মরে।

নবম দৃশ্য

[দিল্লীর অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। বাণী ভারতী সম্প্রদায়ের বাসাবাড়ী-সংলগ্ন বাগান।]

[বিলাওল, মৌলভী ও অপর দুইজন যুবকের প্রবেশ। যুবক দুইজনকে দেখিয়া গুণ্ডা বলিয়া মনে হয়।]

বিলাওল—এইখানে আগামীকাল ফাল্গুনী আর কোহিনূরের বিয়ে হবে। ওরা কিছুতেই এ বিয়ে বন্ধ করবে না। এখন উপায় কি ?

মৌলভী—এমন গোনাহের কাজ আমাদের চোখের সামনে ঘটতে দেব না। আমি মনে মনে এক মতলব ঠিক করে এখানকার দুজন নাম-করা লোক ঠিক করে এনেছি। এদের নিয়ে চল মুস্তাফার কাছে যাই। ভাল কথায় যখন কাজ হল না—ভয় দেখিয়ে কিছু হয় কিনা দেখি।

বিলাওল—ঐ যে দুজনে এদিকে আসছে—চলুন একটু আড়ালে দাঁড়াই।

[ফাল্গুনী ও কোহিনূরের প্রবেশ]

ফাল্গুনী—সকল অনুষ্ঠানের শেষে আসল কাজের পালা।
শীতল বায়ুর পরশ পেয়ে জুড়ায় মনের জ্বালা।
সখি! দিনটা হল লম্বা বেজায়
খোঁড়ার মতন আস্তে যে যায়
হাতের কাছে জল যে তবু শুকায় আমার গলা।
কে জানিত হায় গো সখি তোমার এত জ্বালা।

কোহিনূর—ও এখনই বুঝি জ্বালা টের পাচ্ছ। এর পরে ঘরে নিয়ে গেলে দিনরাতই ত জ্বলবে। তার চেয়ে জ্বালার জিনিস সময় থাকতে ত্যাগ কর।

ফাল্গুনী—আরে এ যে না পাবার জ্বালা—পেলেই সব জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু রানী, আজ কি পৃথিবীটা বড় আস্তে ঘুরছে?

কোহিনূর—আমার কিন্তু বুকটা কেমন ঢিপ ঢিপ করছে। তোমাকে কতদিন ধরে চিনি, জানি—কিন্তু তোমার কালকের রূপ কল্পনা করেই আমার বুকের ভিতরটা কেমন দুরু দুরু করছে।

।— যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ হে মোর মরণ—
সুখে গৌরীর আঁখি ছল ছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলা বরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থর থর
তাঁর হিয়া দুরু দুরু দুলিছে
তাঁর পুলকিত তনু জর জর
তার মন আপনারে ভুলিছে।

কোহিনূর—আহা—উপমা দিচ্ছেন—নিজে যেন শঙ্কর।

ফাল্গুনী—শঙ্কর ত নই—তার সঙ্গী প্রমথ ত হতে পারি। কিন্তু গৌরী ত ঠিকই আছে।

[বিলাওলের দল প্রবেশ করিল]

বিলাওল—দেখলেন মৌলভী সাহেব—এ বেটা খাঁটি হিন্দুয়ানি চালাচ্ছে। মুসলমানের মেয়েকে গৌরী বলছে।

মৌলভী—ওসব চলবে না হে। তুমি যে এই মুসলমানের মেয়েকে ভুলিয়ে হিন্দু করে নেবে—ও সব চলবে না।

কোহিনূর—কি সব বাজে কথা বলছেন আপনি? আর বিলাওল সাহেব—আপনার ত এখানে আসবার কথা নয়। আলীগড় থেকেই ত আপনি দল ছেড়ে চলে গেছেন।

মৌলভী—তোমাদের এই নাপাক কাজে বাধা দিতে এসেছেন বিলাওল সাহেব।

ফাল্গুনী—আমরা দুজনেই নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝি। আর আমাদের বয়সও নাবালকের পর্যায়ে পড়ে না। এ অবস্থায়

আপনারা কেন যে আমাদের ওপর অভিভাবকগিরি করতে এসেছেন তা ত বুঝলাম না।

বিলাওল—দেখ ওস্তাদ। ওসব বাজে কথা শোনবার লোক আমি নই। তোমরা যদি আমাদের কথা না শুন, তবে আমি আমার বুদ্ধিমত যা করতে হয় করব।

কোহিনূর—আমরাও আমাদের বুদ্ধিমত কাজ করছি। এতে আপনাদের কি ক্ষতি ?

মৌলভী—এ কাজ শুধু তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে বাধা দিতাম না। এ কাজ দ্বারা তোমরা সমাজের ওপর আক্রমণ করছ। ধর্মের ওপর উৎপীড়ন করছ। কাজেই না এসে থাকি কি করে ?

ফাল্গুনী—বেশ ত আপনারা ধর্মরক্ষার জন্যে যে এত চেষ্টা করছেন—তার জন্যে ধন্যবাদ। এবার আপনাদের কর্তব্য ফুরিয়েছে—এখন যেতে পারেন।

বিলাওল—যেতে বললেই কি যাওয়া যায়। তোমার কাছে কথা চাই—তুমি এ বিয়ে বন্ধ করবে।

ফাল্গুনী—কিছুতেই বন্ধ হবে না।

কোহিনূর—কোন মতেই নয়।

বিলাওল—বেশ তবে ফল ভোগ কর।

[বিলাওল ইঙ্গিত করিতেই যুবক দুইজনে ছোরা বাহির করিয়া দুই পাশে দাঁড়াইল।]

ফাল্গুনী—তোমরা আমাকে মারবে নাকি ?

বিলাওল—দরকার হলে নিশ্চয়ই মারব।

কোহিনূর—এ কি অত্যাচার! আমাদের ইচ্ছামত আমরা বিয়ে করতে পারব না?

বিলাওল—না। হিন্দু মুসলমান কখনও মিলতে পারে না—আর আমরা মিলতে দেবও না। এর জন্যে আমরা দু'একটি জীবন নষ্ট করতে একটুও দ্বিধা করব না।

কোহিনূর—(চিৎকার করিয়া) আব্বা—আব্বা গুরুজী—সবাই আসুন—

[বিলাওল দৌড়াইয়া গিয়া কোহিনূরের মুখ চাপিয়া ধরিল—কোহিনুর ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। শঙ্করণ ও মুস্তাফা দ্রুত-বেগে প্রবেশ করিল। মৌলভী তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।]

মুস্তাফা—এ কি বিলাওল! তুমি কোহিনূরের গায়ে হাত তুলেছ। (বিলাওলের হাত ধরিল। বিলাওল ঝটকা দিয়া হাত সরাইয়া লইল।)

বিলাওল—এই বুড়ো শয়তান যত অনিষ্টের গোড়া। এর আস্কারা পেয়েই এত বড় অন্যায় কাজ হতে চলেছে।

শঙ্করণ—এরা কে? ফাল্গুনীর পাশে ছোরা-হাতে কি করছে?

ফাল্গুনী—এরা এসেছেন যাতে হিন্দু মুসলমান না মিলতে পারে তার খবরদারি করতে।

বিলাওল—চোপরও কাফের কুত্তা—তোমার সাহায্যকারী এসেছে বলে মনে কর না যে, তোমায় ছেড়ে দেব!

কোহিনূর—দেখুন বিলাওল সাহেব! সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমাদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাদেব যা খুশি গালাগাল করবেন—এ আমরা সহ্য করব না।

বিলাওল—কি করবে তুমি! তুমি ধর্মত্যাগী—তুমি কাফেরেরও অধম—দোজখে যাবে তুমি।

কোহিনূর—সে সময় হলে যাওয়া যাবে।

শঙ্করণ—আচ্ছা! ওস্তাদ—তুমি কেন বিচলিত হচ্ছ! এরা শিক্ষিত—(বলিতে বলিতে বিলাওলের কাঁধে হাত রাখিতেই সে প্রবলবেগে সরিয়া দাঁড়াইল।)

বিলাওল—এই কাফেরটাই সব নষ্টের গোড়া—তুমি জাহান্নামে যাও—(বলিয়া শঙ্করণকে চড় মারিল।)

[সঙ্গে সঙ্গে ফাল্গুনী আসিয়া বিলাওলের হাত ধরিল। মুস্তাফা অপর হাত ধরিল।]

বিলাওল—(চিৎকার করিয়া) তোমরা দুজনে সংয়ের মত দাঁড়িয়ে থাকবে—আর এরা আমাকে মেরে ফেলবে। কি করছ তোমরা?

[যুবক দুইজন তখন ছোরা-হাতে আগাইয়া আসিল। শঙ্করণ—"আহা ছাড় ছাড় ফাল্গুনী—ওস্তাদজী" বলিয়া আগাইতেই একজন শঙ্করণকে আক্রমণ করিল। শঙ্করণ সরিয়া যাইতে ছোরা বাহুমূলে লাগিয়া অল্প কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া জামা ভিজিয়া গেল। মুস্তাফা—"কি সর্বনাশ—গুরুজীকে মেরে ফেলল" বলিয়া সেই দিকে গিয়া সেই যুবকের হাত ধরিল। যুবক ছোরা ঘুরাইয়া নিজেকে বাঁচাইল কিন্তু মুস্তাফার হাতে লাগিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। যুবকদ্বয় পলাইয়া গেল।]

বিলাওল—এ কি খুন-জখম হল যে—আমি কি করি—এই তোমরা পালালে নাকি? মৌলভী সাহেব?

ফাল্গুনী—সবাই পালিয়েছে। তোমাকে পুলিশে দেব।

কোহিনূর—আমি রামভাইকে ডাকি। এখনই পুলিশে খবর দিক। (প্রস্থানোদ্যত)

শঙ্করণ—দাঁড়াও কোহিনূর!

কোহিনূর—না গুরুজী। যারা মিথ্যা ধর্মের মোহে নরহত্যার চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের ক্ষমা করা উচিত নয়। রামভাই—

শঙ্করণ—না, কোহিনূর। আমার বা ওস্তাদজীর কারও আঘাতই গুরুতর নয়। শুধু শুধু বিলাওল সাহেবের দণ্ড হয়—এ আমি চাই না।

ফাল্গুনী—শুধু শুধু! আপনি বলেন কি গুরুজী? আপনার জীবনও ত নষ্ট হতে পারত।

শঙ্করণ—তা যদি হত, তবে ত কিছু করবারই থাকত না। বেঁচে যখন আছি, তখন এই তুচ্ছ ব্যাপারে বিলাওল সাহেবের কিছু হয় এ আমি চাই না। আপনার কি মত ওস্তাদজী?

মুস্তাফা—আমারও তাই মত। অনেক মানুষই নিজেদের বুদ্ধির দোষে বিপথে চলেছে। তারই ফলে ভারত আজ ছিন্নভিন্ন। কিন্তু যদি সেই ভুল-করা মানুষগুলোকে দণ্ড দেওয়া যায়—তবে প্রতিশোধ-স্পৃহা বেড়ে চলে বই কমে না।

কোহিনূর—তাই বলে অন্যায় করে তার শাস্তি পাবে না?

[কেতনের প্রবেশ]

কেতন—কেন পাবে না—নিশ্চয়ই পাবে। (মুস্তাফা ও শঙ্করণের রক্ত বিলাওলের কপালে দিল) হিন্দু মুসলমানের মিলিত রক্তধারা তোমার কপালে পরিয়ে দিলাম—পাপমোচনের

টীকা। বিলাওল ভাই,—আগামীকাল কোহিনূর আর ফাল্গুনীর বিবাহ—তুমি হবে প্রধান কর্মকর্তা।

বিলাওল—গুরুজী! আমার চোখের সামনের কালো পর্দা আজ সরে গেল। বুঝলাম—কি দৃষ্টি চোখে থাকলে মানুষের কাছে ধর্মসম্প্রদায়ের বিভেদ লোপ পায়। (মুস্তাফা ও শঙ্করণের কাছে গিয়া) ওস্তাদজী—গুরুজী—আমাকে সেই দৃষ্টি ভিক্ষা দিন। আমাকে ক্ষমা করুন।

মুস্তাফা—তোমাকে ত কোনদিনই দোষী করিনি বিলাওল। শুধু তোমার ভুলটা দেখছিলাম—আজ মেহেরবান খোদা যদি সে ভুলটা দেখিয়ে দেন—সে তাঁরই কৃপা।

বিলাওল—গুরুজী! (কাঁদিয়া ফেলিল)

শঙ্করণ—কেঁদো না বিলাওল! আমাদের সকলেরই শরীরে বয়ে যাচ্ছে এক রক্ত—সে হচ্ছে ভারতীয় রক্ত। মতবাদের ভুলে বা ভুল প্রচারের ফলে আমরা আজ সৃষ্টি করেছি ভারত-জোড়া বৈষম্য। আমাদের রক্তে আর তোমার চোখের জলে ধুয়ে যাক সেই বিভেদের গ্লানি। ওঠ, প্রতিজ্ঞা কর—সমগ্র ভারতব্যাপী সংহতির প্রচেষ্টাই হবে আমার জীবনের ব্রত।

[রামভগৎ, সুলতানা এবং বাণী ভারতীয় অন্যান্য শিল্পিগণের প্রবেশ।]

বিলাওল—খোদার নামে প্রতিজ্ঞা করলাম—সমগ্র ভারতব্যাপী সংহতির প্রচেষ্টাই হবে আমার জীবনের ব্রত।

কেতন—আজ বড় আনন্দের দিন—আগামীকালের উৎসবের আগে আমরা ওস্তাদ বিলাওলকে আমাদের মধ্যে ফিরে পেয়েছি। এস সকলে মিলে সেই গান গাই—

সমবেত গীত

অনেক রক্ত বহায়েছি মোরা
আর ত শোণিত নয়,
প্রেমের রাখীতে বাঁধিয়া সবারে
গাহি ঐক্যের জয়।
কুমারিকা হতে হিমালয় গিরি
বঙ্গ হইতে গুর্জর ফিরি
একতার ডোরে বাঁধিতে সবারে
দূর করি সংশয়।
ধর্মের ভেদে মনের বিভেদ
হয় নাকো যেন কভু,
ভাষা আমাদের দাস হয়ে থাক
হয় নাকো যেন প্রভু।
মহাভারতের এই মহারথে
এক হয়ে যেন পারিগো টানিতে
সার্থক হোক নব অভিযান
দূরে যাক ঘৃণা ভয়।

[যবনিকা নামিয়া আসিল]

শেষ